সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসার

বিজ্ঞান অন্বেষক

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192
www.bigyananneswak.org.in

বর্ষ -২১ সংখ্যা-২
মার্চ-এপ্রিল ২০২৪
মূল্য : ২০ টাকা

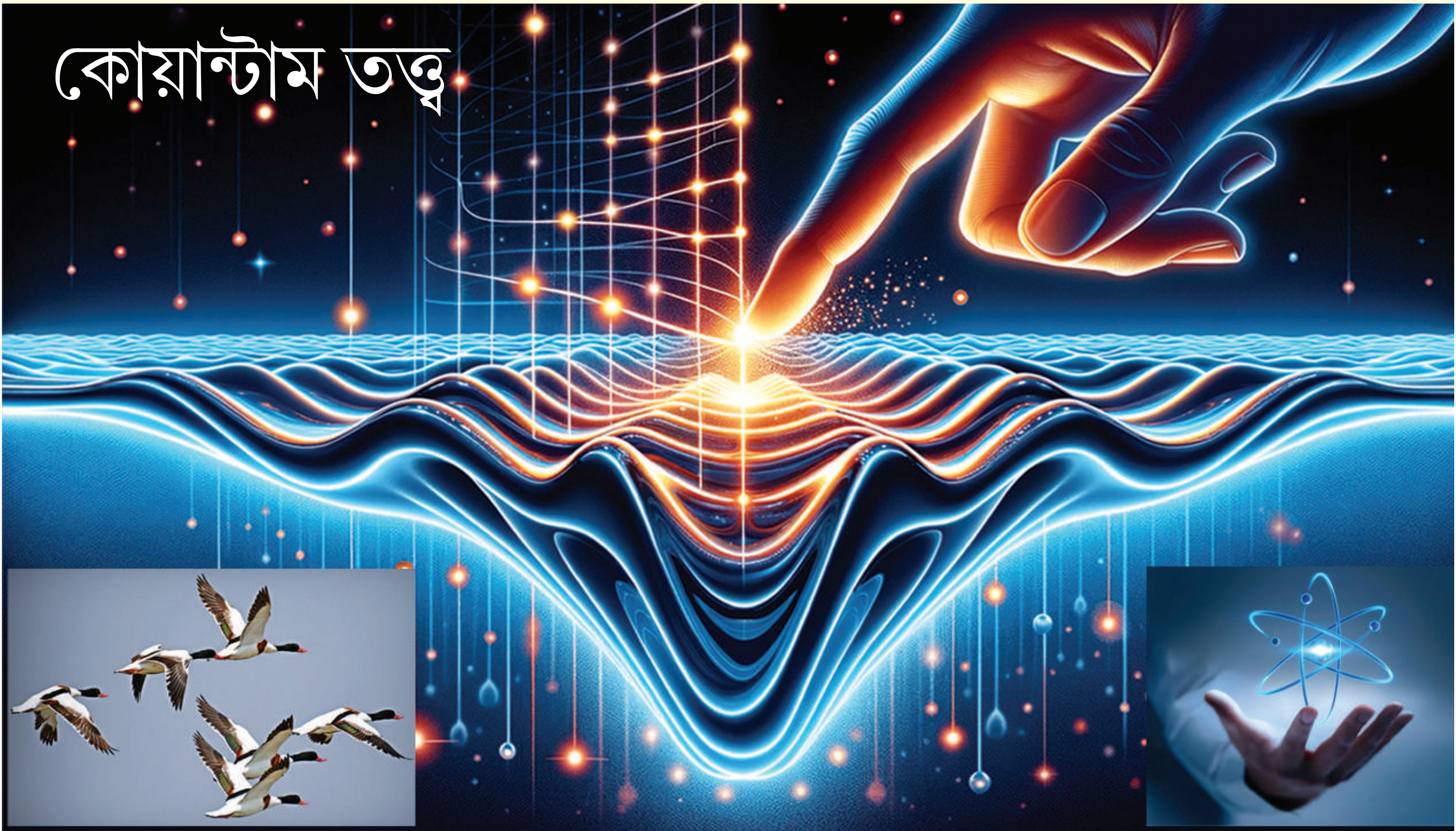

এই সংখ্যায়

❑ কোয়ান্টাম তত্ত্ব ❑ গ্লাইফোসেট ❑ রান্নাঘরের মশলা : জাফরান ❑ বিপন্ন দুর্গাপুর ব্যারেজ ❑ অংক ❑ রঙে চঙে বিজ্ঞান ❑ গাছের মূল্য ❑ প্রতিবন্ধকতার কারণ ও প্রতিকার ❑ পরিবেশ : বাজি ও ডিজে ❑ নদীর জন্য পদযাত্রা ❑ মোটরগাড়ি বনাম সাইকেল ❑ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ❑ স্মরণ : অভিজিত চাকলাদার ও রবীন মজুমদার ❑ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা ❑ পুড়ছে চিলি ❑ অদ্ভুদ দর্শন প্রাণী : টেপির ❑ মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি ❑ তৃতীয় প্রচ্ছদ : বাবুই পাখি বাসভূমি হারাচ্ছে ❑ চতুর্থ প্রচ্ছদ : যারা হারিয়ে যাচ্ছে।

সূচি

১ আমাদের কথা

ডা. সুখময় ভট্টাচার্য
ওষুধ কী

২ প্রচ্ছদ কথা-১
কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক ঝলকে

ডা. বরুণকুমার দত্ত

৫ গ্লাইফোসেট প্রচ্ছদ কথা-২
ড. অনুপম পাল

৭ সংবাদ

৮ প্রচ্ছদ কথা-৩
রান্নাঘরের দামি মশলা জাফরান

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

১০ প্রচ্ছদ কথা-৪
বিপন্ন দুর্গাপুর ব্যারেজের জীবকুল

অমরকুমার নায়েক

১৩ প্রাণী : টেপির
ড. শতাব্দী দাশ
১৪ একিলিস ও কচ্ছপের গল্প

বিকাশ চক্রবর্তী

১৫ পল্লব রায় গুপ্ত
রঙে চঙে বিজ্ঞান

১৭ গাছের মূল্য : ৫০ বছরে ৩ কোটির বেশি

ডা. সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

১৯ প্রতিবন্ধকতার কারণ ও প্রতিকারমূলক পদ্ধতি
ড. সমেধা ব্যানার্জী
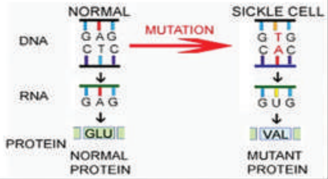

২১ পরিবেশ : বাজি ও ডিজে
গৌতম সরকার

২৩ পায়ে পায়ে ফিরুক স্রোত
ডা. সতীনাথ ভট্টাচার্য

২৫ মোটরগাড়ী বনাম সাইকেল
প্রবীর চন্দ্র বসু

২৬ স্বাস্থ্য : অ্যান্টি অক্সিডেন্ট

অসিত পাল

২৮ স্মরণ
অভিজিৎ চাকলাদার

২৯

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা ঃ পরিবেশ পত্রিকা
রোশনী হালসানা

৩০ পুড়ছে চিলি সংবাদ
রাজদীপ ভট্টাচার্য্য

৩১ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

রবীন মজুমদার
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

৩২ মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি
ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু
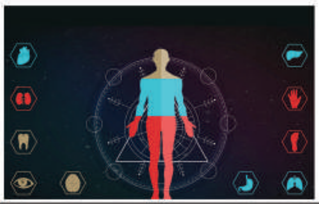

৩য় প্রচ্ছদ
বাবুই পাখি বাসভূমি হারাচ্ছে
তাপসকুমার দত্ত
৪র্থ পরিচ্ছেদ
যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ড. রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সমীর নাগ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস,

: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak
e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

টিম বিজ্ঞান অন্বেষক

আমাদের কথা

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

সি ভি রমন ১৯৩০ সালে 'রমন এফেক্ট' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। রমনের এই গবেষণায় সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। এই যুগান্তকারী আবিস্কারের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে পদার্থ-রসায়ন-জীব বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ১৯৮৬ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন (NCSTC) ভারত সরকারের কাছে ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করার প্রস্তাব দেয়। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এই দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ঘোষণা করেন।

সারা ভারতে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ভাবনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আমাদের ভাবনা। আর এই ভাবনার শরিক আমাদের এই বিজ্ঞান পত্রিকা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসারের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। আমরা সর্বস্তরের মানুষকে এই প্রচেষ্টার শরিক হওয়ার আহ্বান জানাই।

ডা. সুখময় ভট্টাচার্য

ওষুধ কী?

একটা পুরনো সংস্কৃত বচন আছে 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।' কথাটা সঠিক নয়। আমাদের শরীর ব্যাধির মন্দির বা আবাসস্থল নয়। অসুখে আমরা আক্রান্ত হই মাঝে মধ্যে, প্রতিনিয়ত অসুস্থতা শরীরে বহন করি না। পুষ্টির জন্য ন্যূনতম খাদ্য এবং কিছু পারিবেশিক বিষয়, যথা পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি অনুকূল থাকলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সুস্থ থাকে। এসবের ঘাটতি হলে আমরা অসুস্থ হই, আমাদের শরীর-মনের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। অসুস্থতার একটা আপাত কারণ থাকে, যেমন কোন অণুজীবের সংক্রমণ। মূল কারণ কিন্তু এই আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির অভাব। তাই ডাক্তার আপাত কারণের চিকিৎসা করে কাউকে অল্পকালের জন্য সুস্থ করেন, জনপদ থেকে রোগটি উচ্ছেদ করতে পারেন না।

অসুস্থ অবস্থা থেকে শরীর-মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে জিনিসগুলি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলিই হল ওষুধ। অর্থাৎ ওষুধ রোগ সারাতে প্রযুক্ত হয়, রোগকে নির্মূল বা প্রশমিত করে শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। অনেক রাসায়নিক পদার্থ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত পদার্থ বা 'বায়োমলিক্যুল'-এরও ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ আছে। যেমন— অ্যাসপিরিন, সাল্ফা ইত্যাদি হল রাসায়নিক পদার্থ; ইনসুলিন, ভিটামিন বি ও বায়োমলিক্যুল।

অসুখ সারাতে ওষুধ লাগে কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের শরীরের একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধী ও মেরামতী ব্যবস্থা আছে, যা অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের সহায়তা ছাড়াই শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। **শারীরক্রিয়ার সামান্য কিছু হেরফের হলেই ওষুধ খেতে ছুটতে হবে, এ ধারণা ভুল।**

তেমনি ভুল ধারণা হল, ওষুধ খেয়ে শরীর চাঙ্গা করা, লম্বা-চওড়ায় বাড়ানো, মনোযোগ স্মরণশক্তি ইত্যাদি মস্তিষ্কের কাজকর্ম উন্নত করা প্রভৃতি। ওষুধ দিয়ে শারীরিক আকার বা ক্রিয়ার উন্নতি ঘটানো যায় না। আমার উচ্চতা কতটা হবে, দৈহিক গঠন কেমন হবে, মননক্রিয়ার কোন্ কোন্ দিকে আমি পারদর্শী হব, এসবই আমার দেহকোষের ভেতরে জিনে লিপিবদ্ধ আছে এবং এগুলি মাতাপিতার কাছ থেকে আমাদের মধ্যে বর্তেছে। অনুকূল পরিবেশে এগুলি পুরোপুরি বিকশিত হয়, ঠিকমতো পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি না পেলে বিকাশ ব্যাহত হয়। **হাজারো ওষুধ খেলেও দৈহিক মাপ বাড়ে না, মানসিক উৎকর্ষ ঘটে না।**

(ওষুধ-বিষুধ জনস্বাস্থ্য সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, প্রকাশ-১ জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে সংগৃহীত)

ISSN 2582-5674

9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯১৪৩২৬৪১৫৯/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩

প্রচ্ছদ কথা ১

ড. ব রু ন কু মা র দ ত্ত

কোয়ান্টাম তত্ত্ব—এক ঝলকে

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এক বৈপ্লবিক ধারণার উপস্থাপনায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা করেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বাইরে এই ব্যাপারে প্রথমদিকে কিছু ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু পরে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সমৃদ্ধ হয়ে এই তত্ত্ব আজ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান স্তম্ভ এবং বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংক্ষেপে ও সহজভাবে সেই আলোচনা।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে বিকিরণ সংক্রান্ত পরীক্ষালব্ধ ফলকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। বিশেষ করে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ ফল একেবারেই মেলে না। এছাড়া ডুলং পেটিট সূত্র অনুসারে উচ্চতর উষ্ণতায় সব কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ প্রায় সমান হয়; কিন্তু নিম্ন উষ্ণতায় তা হয় না কেন—সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানে তার উত্তর ছিল না। 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক শক্তির বিকিরণের (Rediation) সম্পূর্ণ নতুন একটি বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে বিকিরণের শক্তির নিঃসরণ (emission) বা শোষণ (Absorpation) নিরবিচ্ছিন্ন (Continuously) ভাবে হয় না, হয় বিচ্ছিন্ন (Discreate) ভাবে—ঝাঁকে, ঝাঁকে (By Yerks) বা গুচ্ছে গুচ্ছে (Bunch)। বিকিরণ তখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খন্ড খন্ড ভাবে (Discontinuously) কণার মত আচরণ করে। প্ল্যাঙ্ক এই কণার (Energy Particle) নাম দিয়েছিলেন কোয়ান্টা (Quanta)। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠল তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব। অর্থাৎ বিকিরণের কণা ধর্ম হল (Particle nature of Rediation) এই তত্ত্বের মূল কথা। শক্তির দেওয়া নেওয়ার সময় তার যে কোন (arbitary) মান সম্ভব নয়; এই শক্তিকে একটি খুব ছোট মূল এককের (বা প্যাকেটের) পূর্ণ সংখ্যক গুণিতক হতে হবে। বলা বাহুল্য এই যুগান্তকারী মতবাদ সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বিরোধী। শক্তির এই মূল এককের নাম হল কোয়ান্টাম (Quantum of energy), এই সংক্রান্ত ফর্মুলাটি হল $E = nh\delta$, $n = 0, 1,2,3...$ যেখানে E = শক্তি, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক = 6.62×10^{-27} erg.Sec. এবং δ = কম্পাঙ্ক (Frequency), $n = 0$ হলে শক্তির সর্বনিম্ন স্তরকে বোঝাবে। কণা ও তরঙ্গের ধারণাকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে একই ভাষায় আমরা বর্ণনা করতে পারি। এখানে কণাতরঙ্গ বা তরঙ্গকণার (Wavicle) মাপকাঠি হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h। মনে রাখতে হবে, যেখানে বস্তু সম্পর্কিয় মাপজোখ h-এর সঙ্গে তুলনীয়, সেখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন পরমাণুর অন্দরমহলে ইলেকট্রনের গতিবিধি হিসেব করতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ছাড়া চলে না। এছাড়া বস্তুর ভর যখন খুবই ছোট এবং তাপমাত্রা অতিশয় নিম্ন তখন কোয়ান্টাম তত্ত্বই কাজে লাগে। এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট হল যে এর সকল সমীকরণের মধ্যে একটি সর্বজনীন ধ্রুবকের (প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক) অস্তিত্ব। শক্তি বন্টন (Energy distribution) সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত সমীকরণ প্ল্যাঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন যেটি ছোট থেকে বড় সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সব বিকিরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবার কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি ঐ সমীকরণের সাথে ঠিকঠাক মিলে গেল—বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে প্রয়োগ করে 1905 সালে আইনস্টাইন আলোক তড়িৎক্রিয়ার (Photo electric effect) সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—এখানেই তিনি আলোর দ্বৈত রূপ (Dual Nature), ও তরঙ্গরূপের কথা বলেছিলেন। আইনস্টাইন আলোর এই বিশেষ শক্তি কণিকার নাম দিয়েছিলেন ফোটন। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী নীলস্ বোর পরমানুর গঠনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী সমারফেল্ড আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর, সমারফেল্ড ইত্যাদি বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অসামান্য গবেষণা এই তত্ত্বকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (Quantum Mechanics) সূচনা এইভাবেই হয়েছিল যার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কণাদের (Microscopic Particles) বিভিন্ন আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সেইজন্য এই তত্ত্বকে পুরনো কোয়ান্টাম তত্ত্ব (old quantum theory) বলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমদিকে প্রায় ২০ বছর এই তত্ত্বে কিছু ধোঁয়াশাও ছিল। নীলস বোর নিজেই লিখেছিলেন— If you are not confused by quantum physics, then you are not really understood it. আসলে এই তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি সেইরকম শক্তপোক্ত ছিল না। সেই সময় অনেকেই এই কোয়ান্টাম ব্যাপারটিকে illusion ভেবেছিলেন এবং এই তত্ত্বের মূল ধারণাটিকে একটা illusive idea বলে মনে করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল, যা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না, সেগুলি এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে গণনার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গেল। যাইহোক, পুরনো কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরও সম্প্রসারিত করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেন, লুইস দ্য ব্রগলী, হাইসেনবার্গ, শ্রোয়েডিংগার, ডিরাক ইত্যাদি বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা।

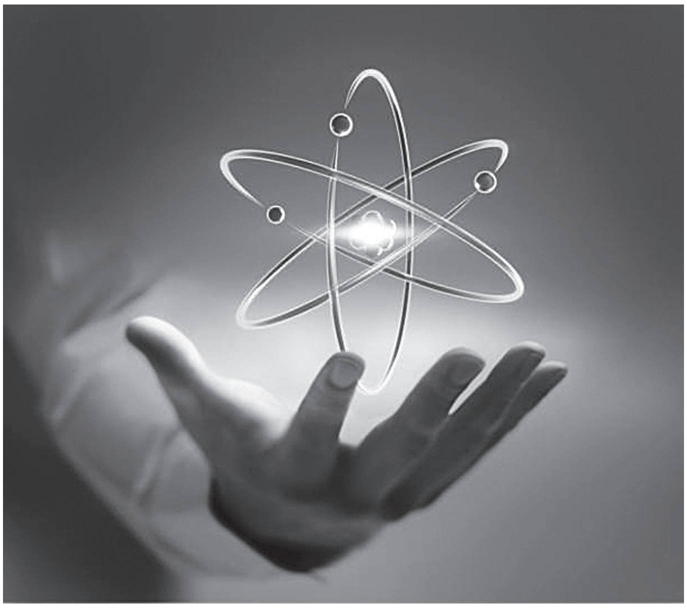

বস্তুতরঙ্গ—1924 সালে ব্রগলী দেখালেন শুধু আলো কণিকা ফোটন নয়, বিশ্বের যাবতীয় ছোট অথবা বড় বস্তুকণার দ্বৈতসত্তা রয়েছে। তাঁর যুক্তি প্রকৃতি দুইভাবে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত—বস্তু ও বিকিরণ। বিকিরিত শক্তির দ্বৈত সত্তা থাকলে প্রতিসাম্য (Symmetry) অনুযায়ী বস্তুর ও দ্বৈতসত্তা থাকবে। একদিকে তারা কণাধর্মী এবং অপরদিকে তরঙ্গধর্মী। (Duality of matter and wave) অর্থাৎ ছোট বা বড় সব বস্তুরই তরঙ্গ আছে। তিনি প্রমাণ করলেন কোন চলমান বস্তুর ভর m এবং বেগ v হলে ওই বস্তুটির বস্তুতরঙ্গ (Matter waves)-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে, h = $\frac{h}{mv}$, যেখানে h = বস্তুর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। প্রশ্ন হল বস্তুর তরঙ্গের ব্যাপারটা আমরা রোজকার জীবনে দেখিনা কেন? উত্তরটা সহজ, ধরা যাক 10 গ্রাম ভরের একটি লোহার বল প্রতি সেকেন্ডে 1 মিটার (= 100 সেমি) বেগে গতিশীল। তাহলে উপরের সম্পর্কটি থেকে বলটির সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে h = 6.62×10^{-30} সেমি, যা অতীব ছোট। বলা বাহুল্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বড় হয়, তরঙ্গের ধর্ম তত সহজে দেখা যায় ও বোঝা যায়। সেইজন্য লোহার বলটি কখনই তরঙ্গধর্ম দেখাতে পারে না, সেটি একটা নির্দিষ্ট পথেই গতিশীল থাকবে। দ্য ব্রগলীর সমীকরণ ও কণাতরঙ্গের দ্বৈত সত্তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে কণা ধর্মের প্রকাশ (Characterized) তার ভরবেগ, p = mv দ্বারা এবং তরঙ্গ ধর্মের প্রকাশ তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য h দ্বারা হয়ে থাকে। h = $\frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$ সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে ভরবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরস্পর ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ কণাধর্ম বাড়লে তরঙ্গধর্ম কমে এবং এর উল্টোটিও সত্য। বড় বস্তুর (Macroscopic particle) ভরবেগ যেহেতু বেশি সেইজন্য তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতীব ক্ষুদ্র হওয়ায় পরীক্ষায় ধরা পড়ে না এবং তার তরঙ্গরূপ আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। আসলে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান খুব ছোট হওয়ার জন্য আমরা রোজকার জীবনে কোয়ান্টাম প্রভাব দেখি না।

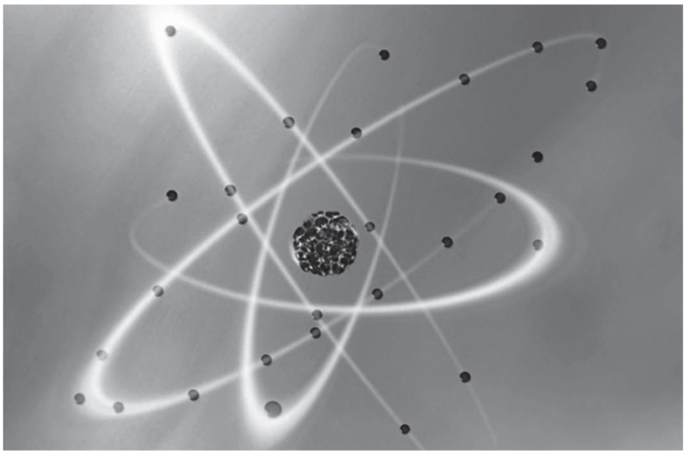

অনিশ্চয়তা নীতি ও সম্ভাবতা—কোয়ান্টাম তত্ত্বে রয়েছে অনিশ্চয়তা ও নিশ্চিত ভবিষ্যতবাণী করার অক্ষমতা অর্থাৎ সম্ভাবতা। আমাদের সাধারণ চাক্ষুষ জগতে এগুলি নেই। এই তত্ত্বে অবস্থান ও ভরবেগ অথবা সময় ও শক্তি এই পরিবর্তনশীল রাশিগুলি হল বিনিময় অযোগ্য। কণা—তরঙ্গের দ্বৈত চরিত্রের ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোন বিশেষ সময়ে পাওয়া তথ্যকে সীমিত করে দেয়। অর্থাৎ কণা-তরঙ্গের দ্বৈত ধর্মের জন্য এই তত্ত্বে বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ একই সঙ্গে জানা যায় না। যেহেতু জানার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা (Uncertainly) রয়েছে। সেইজন্য এটিকে অনিশ্চয়তা সূত্র বলা হয়। 1927 সালে বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ এটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। ধরা যাক সময় যখন t-এর কাছাকাছি তখন একটি কণার অবস্থান, ভরবেগ ও শক্তি যথাক্রমে X, P ও E -এর কাছাকাছি। পরিমাপের যে কোন সামান্য ভুল বা অনিশ্চয়তাকে আমরা δ (ডেল্টা) দ্বারা সূচিত করি। অর্থাৎ δx হচ্ছে কণাটির অবস্থানের পরিমাপের ভুল বা অনিশ্চয়তা, δP তার ভরবেগের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। এইসব পরিমাপের জন্য হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রটি হল,

$$(\delta x)\ (\delta p) \geq \frac{h}{4h^2}$$

এবং $(\delta t)\ (\delta E) \geq \frac{h}{4h^2}$

যেখানে h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক,

এই সূত্রের মূল কথা হল, আমরা যতই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, একটি কণার অবস্থান ও ভরবেগ দুইটি একসঙ্গে যে কোন সূক্ষ্ম তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ধরা যাক কোন কণার অবস্থান δx পরিমাণ নির্ভুলতায় পরিমাপ করা হল, তাহলে অনিশ্চয়তা সূত্র অনুযায়ী কণাটির ভরবেগ $\frac{h}{\left(4h^2\right)\delta x}$ পরিমান অনিশ্চত হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য অবস্থান যদি একেবারে নির্ভুল হয় (δx = O) সেক্ষেত্রে ভরবেগ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। একইভাবে বলা যায়, একটি কণা পর্যবেক্ষণ করার সময়কে যতই সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিমাপ করি, কণাটির শক্তির পরিমাণ ততটাই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। সাবেকি বলবিদ্যা ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অতি ক্ষুদ্রজগতে পর্যবেক্ষণের মৌলিক তফাৎ রয়েছে। এটা বুঝতে হলে ধরা যাক আমরা অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে একটি ইলেকট্রনকে দেখার বা অবস্থান জানার চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য দেখতে হলে তার উপর আলো ফেলতে হবে। অতিক্ষুত্র আকার ও ভরবৈশিষ্ট্য ইলেকট্রন আলোক কণিকা ফোটনের আঘাতের অব্যবহিত পরেই তার অবস্থান জানা যাবে। ইলেকট্রন ও ফোটনের পারস্পরিক আন্তক্রিয়ার (Interaction) ফলে ইলেকট্রন কণিকার ভরবেগ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তার অভিমুখও বদলে যায়। সেইজন্য তার অবস্থান জানা গেলেও ভরবেগের সঙ্গে অনিশ্চয়তা এসে যায়। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে পর্যবেক্ষণের যন্ত্র যতই উন্নত হোক না কেন সেটিও কোয়ান্টাম অবস্থার (Quantum State) অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। অনিশ্চয়তা কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্নিহিত (Inherent) ব্যাপার এবং হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হল তার রক্ষাকবচ। সনাতনী বলবিদ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ জানা থাকলে তার গতিপথ (Trahectory) নির্ণয় করা যায়।

কিন্তু অনিশ্চয়তা নীতির জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণার সুনির্দিষ্ট সঠিক গতিপথের কোন অস্তিত্বই নেই—যা এই তত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতা (Limitation)। আগের প্রশ্নটি আবার ধরা যাক। আমাদের রোজকার চাক্ষুষ জীবনে অনিশ্চয়তা নীতির কোন প্রভাব নেই কেন? ব্যাপারটা বোঝা সহজ। প্রথমে সূত্রটিকে গতিবেগের আকারে প্রকাশ করে পাওয়া যায়,

$(\delta x)\ (\delta v) \geq \frac{h}{4h^2 m}$, যেখানে বস্তুর ভর m এবং গতিবেগ হল VI ধরা যাক একটি ভারি বস্তু (মোটরগাড়ি) V গতিবেগে গতিশীল

রয়েছে। এক্ষেত্রে ডানদিকের $h/4h^2m$ রাশিটির মান অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায়—যাকে প্রায় শূন্য হিসাবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে না, বস্তুটির অবস্থান ও গতিবেগ সঠিক ভাবেই আমরা নির্ণয় করতে পারি, যেটি সাবেকি বলবিদ্যার সঠিক ও স্বাভাবিক ফলাফল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বিচার কোয়ান্টাম জগতে অচল। যেমন চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে পরিমাপ করা না গেলেও কণার অবস্থান ও অস্তিত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে পরিমাপের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার সর্বত্র থাকার সম্ভাবনা এবং অস্তিত্ব দুটোই আছে। বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলে দেখা যায়, অনিশ্চয়তা থাকলেও কোয়ান্টাম তত্ত্ব পুরোপুরি সঠিক। সেইজন্য এই তত্ত্বে নিশ্চিত বলে কিছু হয় না—এমনটা কিন্তু নয়।

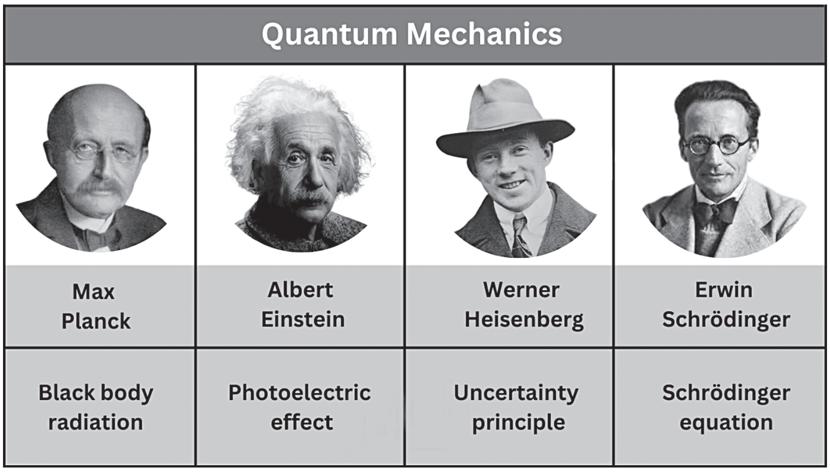

এবার কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা। আমরা দেখেছি অতিক্ষুদ্র কণাদের জগতে (ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদি) কোয়ান্টাম তত্ত্ব অপরিহার্য্য। চিরায়ত বিজ্ঞানের পরিমাপযোগ্য রাশিগুলির যেমন অবস্থান, ভরবেগ, শক্তি ইত্যাদির পরিমাপ আগের মতন সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করণ (Determinism) আর সম্ভব নয়। তাদের পরিমাপের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা প্রবেশ করল। 1926 সালে ইলকট্রনের তরঙ্গধর্মের ব্যাখ্যায় শ্রোয়েজিংগার তাঁর তরঙ্গ সমীকরণ (Wave Eqution) আবিষ্কার করলেন। এই সমীকরণের সমাধান যাকে বলা হয় তরঙ্গ অপেক্ষক (Wave function), কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার (Probability) ধারনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। দুর্ভাগ্যবশত এই সময় (1925-26) থেকেই আইনস্টাইনের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নব্যরূপকারদের বিরোধের সূত্রপাত। তবে তা অন্য প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। এখানে মনে রাখা দরকার, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাবনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্ভাবনার থেকে আলাদা। যেমন একটি মুদ্রার টস করার সময় (হেড অথবা টেল পাওয়া) অথবা লুডো খেলায় ছক্কা চালার সময় (এক থেকে ছয় পর্যন্ত পাওয়া) ইত্যাদি ব্যাপারে সেইরকম নয়। এখানে সম্ভাবনার যে গাণিতিক রূপটি আসে, সেটি ঐ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার প্রতিফলন রূপে। অন্যদিকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনা হল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত (Inherent) চরিত্র অর্থাৎ যেমন ইচ্ছে কাজ করার খামখেয়ালি (Random) প্রবণতার প্রতিফলন।

অনিশ্চয়তা সূত্র কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি মৌলিক নীতি। এই নীতি ও তরঙ্গ সমীকরণকে হাতিয়ার করে ডিরাক, পাউলি, বর্ণ, ফার্মি, ফাইনম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে এটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। তবে এই বিষয়গুলি খুবই গণিত নির্ভর ও জটিল—আমাদের এই প্রাথমিক স্তরের আলোচনার বাইরে।

শেষপাত—বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক বিবাদ যাইহোক, আধুনিক জীবনে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। এই তত্ত্বের সাহায্যেই আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান তৈরি করেছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। যেমন স্মার্ট মোবাইল ফোন, লেজার প্রযুক্তি, অতিপরিবাহিতা তত্ত্ব, অতি শক্তিশালী কোয়ান্টাম কম্পিউটার, অত্যাধুনিক ঘড়ি, MRI স্ক্যানার ইত্যাদি। প্রকৃতির অনেক অজানা রহস্যের সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যেই—এমনটাই ধারণা অনেক বিজ্ঞানীদের।

I think I can safely say that nobody understands quantum mechancs.

—Richard Feynman.

তথ্যসূত্র :

১. কোয়ান্টাম বলবিদ্যা—ড. এস. এন. ঘোষাল, ক্যালকাটা বুক হাউস (২০০৭)
২. কোয়ান্টাম তত্ত্ব—ড. পরিমল মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (২০১৬)
৩. কোয়ান্টাম বলবিদ্যা—বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, বাউলমন প্রকাশন (২০১৫)
৪. Science Reporter, March (2017)

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: drbkdm@gmail.com • M. 9433775743

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা

যখন পৃথিবী বিপন্ন
November December. 2022

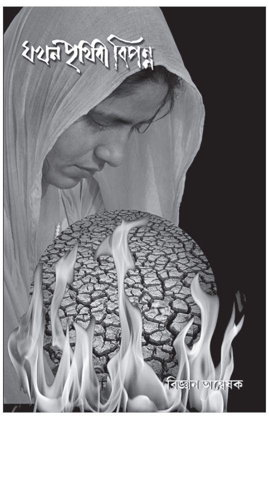

রসনার রসায়ন
November-December 2022

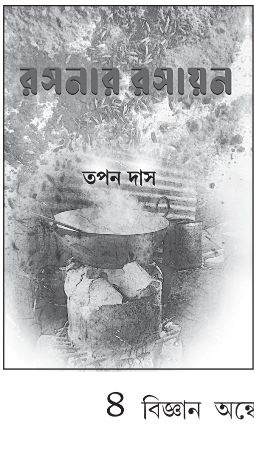

আমরা সবাই তারার অংশ
November-December 2022

গাছের প্রাণ
January 2024

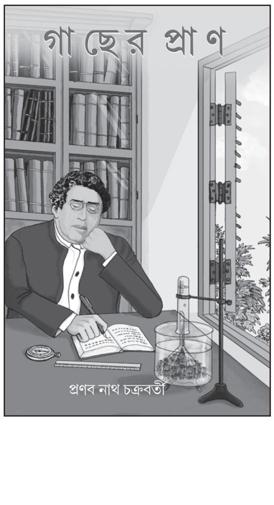

ড. অনুপম পাল

গ্লাইফোসেট—অন্যতম বিষাক্ত গাছ মারা বিষ

গোড়ার কথা

আধুনিক চিকিৎসার ওষুধের যেরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে রাসায়নিক কৃষি উপকরণেরও মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পর আমাদের মগজ ধোলাই এমনভাবে হয়েছে যে আমরা মেনে নিয়েছি যাহাই পাশ্চাত্য তাহাই উৎকৃষ্ট। ঔপনিবেশিক শাসনের মহিমার কথা বলি। যেন ইংরেজরা না আসলে দেশটার নাকি 'উন্নতি' হত না। কালো লোকের জন্য সে কালের চালু শাসন ব্যবস্থা অনুকরণ করছি। কী বৈপরীত্য দেখুন আবার স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন বলি দিয়েছিলেন তাঁদের জন্মদিন ঘটা করে পালন করি। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের কথা বলি। কিন্তু তাঁদের সমাজ চিন্তার এক বিন্দুও গ্রহণ করিনি। দুর্ভিক্ষ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জুজু দেখিয়ে পাশ্চাত্যের পুঁজি ভিত্তিক রাসায়নিক কৃষিকে অন্ধ অনুকরণ করা হল। সেই ভাবে হাজার হাজার পরীক্ষিত দেশজ কৃষি সবকিছু ব্রাত্য হয়ে গেল। দেশজ অজস্র ও অমূল্য ফসল বৈচিত্র্যের কথা মানুষ জানতেই পারলেন না। ঔপনিবেশিক মহিমায় দেশজ সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, কম খরচের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন চিকিৎসার কথা ভুলিয়ে দেওয়া হল। বিষাক্ত খাবার, খাদ্যাভাস ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের ফলে প্রচুর রোগব্যাধি বেড়েছে। আপৎকালীন আধুনিক চিকিৎসার দরকার পড়েছে। ঘরে ঘরে রোগ। মুদির দোকানের সওদা কেনার মতো এখন মাসকাবারি আধুনিক ওষুধ আসে। আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছি। এখন সবুজ বিপ্লবের রাসায়নিক কৃষির খারাপ দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

আগাছা ধারণা

ফসলের বৃদ্ধির প্রথম দিকে অন্য উদ্ভিদে যাকে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ বলা হয়, বৃদ্ধি বেশি হলে মূল ফসলের বৃদ্ধি ব্যহত হবে। আসলে সূর্যালোকের জন্যই প্রতিযোগিতা। সহযোগী উদ্ভিদের (অন্য উদ্ভিদ বা অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ) বৃদ্ধি মূল ফসলের থেকে বেশি হলে মূল ফসল ঠিক মতো সূর্যালোক পায় না। ফসল বৃদ্ধির শেষ দিকে অন্য ফসল (আগাছা) কিছু থাকলেও মূল ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা কম। আগে জমিতে জন্মানো নানা ধরনের সহযোগী উদ্ভিদকে নিড়ানী করে দেওয়া হত। বেশ কিছু উদ্ভিদকে ধান জমির কাদা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। জৈব সার হওয়ার জন্য। সহগোষ্ঠী উদ্ভিদই জৈব সারের যোগান দেয় জৈব সম্পদের পুনরাবর্তনের মাধ্যমে। অর্থাৎ আগাছাও একটা জৈব সম্পদ। ধানের জমিতে জন্মানো ২২ রকমের উদ্ভিদ মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য, বীজ, পাখির খাদ্য, আবার ঔষধিগুণসম্পন্ন উদ্ভিদও রয়েছে। শুষনি, আমরুল, হুড়হুড়ে, বনলবঙ্গ ইত্যাদি। জলজ ধান ইকোসিস্টেমে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী ভাসমান ফার্ন-আজোলা জমির প্রভূত উপকার করে জমির জৈব পদার্থ যোগান দেওয়া ছাড়াও নাইট্রোজেন ও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহ করে। ধানক্ষেতে জন্মানো বাড়তি আজোলা তুলে নিয়ে মাছ, হাঁস, মুরগি ও গরুকে খাওয়ানো হয়। অ্যাজোলা ধানের জমিতে ৭ দিনে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আগাছা-জমির পরিচায়ক, আগাছা দেখে ধানের ফলন আন্দাজ করা যায়, মাটির খাবারের অভাবের কথা জানা যায়। আগাছাই মাটির নিচের স্তরের উদ্ভিদ খাদ্য উপরের স্তরে শিকড়ের মাধ্যমে টেনে নিয়ে আসে। বহু জায়গায় ধানে একবার নিড়ানি করা হয়। ঝাড়খণ্ডে অনেক জায়গায় একবারও করা হয় না।

আগাছা নাশক

১৯৮০ দশকের পরে জমিতে উদ্ভিদনাশক প্রয়োগ শুরু হল। চটজলদি উদ্ভিদনাশকের ব্যবহারে উদ্ভিদ মারা যায়, নিড়ানি খরচ বেঁচে যায়। কিন্তু তারপর? জমিতে কি প্রাকৃতিক জৈব সারের যোগান বজায় থাকল কী না, মাটির অণুজীবের ও কেঁচোর কী ক্ষতি হল, মূল ফসলের কী ক্ষতি হল, অণুখাদ্যের অভাব হবে কী না, সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে কী না, ফসলে আগাছানাশক বিষ প্রবেশ করল কী না। ওই বিষের প্রভাবে মানুষ ও পশুপাখির কী কী অসুস্থতা দেখা দেয়, ওই সব রোগের চিকিৎসা ব্যয় বা কত? মাটির গুণগত মান খারাপ হচ্ছে কী না, বন্ধ্যাত্ব হচ্ছে কী না এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানা দরকার। এসব নিয়ে উপকরণ বিক্রেতা, যারা বিক্রির ছাড়পত্র দিলেন, যারা এর স্বপক্ষে ব্যবহারের মত দেন এবং কৃষকরাও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের বেশ কিছু রাসায়নিক আগাছানাশক চালু আছে। সেগুলি হল: গ্লাইফোসেট, আইসোপ্রোটিউরন, পেনডিমেথালিন, ২-৪-ডি, প্যারাকোয়াট। জিরোটিলেজ গম ও ধান চাষে সুপারিশ করা হয়।

গ্লাইফোসেট

এর মধ্যে গ্লাইফোসেট একটি বহুল প্রচলিত আগাছানাশক। এই মুহূর্তে গ্লাইফোসেটকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম মারাত্মক রাসায়নিক যা জৈব

যুদ্ধে মানুষ মারার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিনশস্যের উদ্যোক্তারা আবার গ্লাইফোসেট সহনশীল সয়াবীন, সরিষা, ধান ইত্যাদি ফসল তৈরি করেছেন। অর্থাৎ ওই ফসল মাঠে থাকা অবস্থায় গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে ফসল মারা পড়বে না কিন্তু আগাছা মারা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা শ্রম সাশ্রয়কর হলেও এর অবশেষ ফসলে, জমিতে থেকে যায়। জমির কেঁচো, অণুজীব, অণুখাদ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। এইসব তথ্য চেপে যাওয়া হচ্ছে স্রেফ ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে।

১৯৬৪-তে এর ব্যবহার শুরু হয়। সাধারণত: গরম জলের পাইপ ও ব্রয়লারে পাইপের ভিতর জমা খনিজ পদার্থ বের করার জন্য গ্লাইফোসেটের ব্যবহার হত। ওই রাসায়নিকটি ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম ও বোরনের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে জলে দ্রাব্য রাসায়নিকে পরিণত করে।

১৯৭০-এর মনসান্তো কোম্পানি উদ্ভিদ মারা রাসায়নিক আগাছানাশক (হার্বিসাইড) হিসাবে পেটেন্ট নেয় এবং ১৯৭৪-এ থেকে বাজারে চালু হয়। এটি উদ্ভিদের পাতার মধ্যে দিয়ে শোষিত হওয়ার ফলে শারীরবৃত্তীয় কাজ ও উৎসেচকের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয়, অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হওয়া বন্ধ হয় এবং মাটিতে বহু প্রয়োজনীয় মৌল আবদ্ধ করে দেয় ফলে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় মৌল গ্রহণ করতে পারে না। ওই জমিতে হওয়া ফসলের পুষ্টিগত মান কমে যায় এবং উদ্ভিদ খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

প্রয়োগ করার কয়েক দিন পর উদ্ভিদ মারা যায়। তুলো, চা বাগান ও রবার বাগানে মূলত ব্যবহারের কথা বলা হলেও এখন সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে। জিনশস্য তুলো, সয়াবিন, ভূট্টাতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আখ কাটার আগে শ্রীলঙ্কায় আখে স্প্রে করা হয়, এতে মিষ্টত্ব বাড়ে। কানাডার প্রচুর জমিতে মসুর, ছোলা ইত্যাদি ডাল চাষ করা হয়। এতে ফসল কাটার সুবিধার জন্য পাকার কিছুদিন আগে গ্লাইফোসেট ব্যবহার করা হয় ফলে তাড়াতাড়ি ডালগাছ শুকিয়ে যায়। স্বভাবতই ওই ডালে মাত্রাতিরিক্ত গ্লাইফোসেটের অবশেষ থেকে যায়। উল্লেখ্য ওই ডাল প্রচুর মাত্রায় ভারতে আমদানি করা হয়। ভারতে ৫-৭ মিলিয়ন টন আমাদানিকৃত ডালের প্রায় অর্ধেক আসে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। কানাডা ফুড ইন্সপেকশন এজেন্সি মুগ ও মুসুর ডালের মধ্যে গড়ে যথাক্রমে ১০০০ ও ২৪২ পার্টস (২.৮২ মিগ্রা/কেজি) পার বিলিয়ন গ্লাইফোসেটের অবশেষ পেয়েছে। কোডেক্সের নির্ধারিত মাত্রা হল ২০ মিগ্রা./কেজি। কানাডা প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একক আন্দোলনের ফলে কানাডার গ্লাইফোসেটের টেস্ট করা হচ্ছে। আগে হত না। তিনি এই নিয়ে ভারতেও একক আন্দোলন চালাচ্ছেন। ফুড সেফটি ও স্টানডারডস অর্থরিটি অব ইন্ডিয়া (FSSAI) ১২ অক্টোবার ২০১৮-এ বিজ্ঞপ্তি করে জারি করে বলেছে যে আমদানীকৃত ডালে পরীক্ষা করে জানাতে হবে গ্লাইফোসেটের কতটা অবশেষ আছে। ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ পাইওনিয়ার পত্রিকায় বলা হয়েছে আমদানীকৃত ডাল বিষাক্ত এবং জনসাধারণের ওই ডাল না খেলেই ভালো হয়। বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে ওই ডালগুলো বিক্রি হয়। উল্লেখ্য ভারতে ওই আগাছানাশক পরীক্ষা করবার নির্দিষ্ট ল্যাব নেই বললেই চলে। মানবদেহের ক্ষতিকর প্রভাব হল খাদ্যের মাধ্যমে ওই বিষ শরীরে প্রবেশ করে। হজমের গণ্ডগোল, হরমোনের অসাম্য, মূলত ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যানসার সৃষ্টি করে। বিশেষত নন হজকিন্স লিম্ফোমা ক্যানসার (Hazardous Substance Fact Sheet-NJ Govhttp:/nj.gov)।

গমের প্রোটিন গ্লুটেন অনেকের শরীরে অ্যালার্জি তৈরি করে। পেটেরও গোলোযোগ হয়। তাই গ্লুটেন মুক্ত খাবার মিলেট ও চালের প্রভৃত বিজ্ঞাপন দেওয়া আসলে এই অ্যালার্জির জন্য দায়ী গ্লাইফোসেট। অথচ সেই বিষয় চেপে যাওয়া হচ্ছে (Glyphosate may affect human gut microbiotahttps://www.sciencedaily.com/release/2020/11/20095858.htm)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২০ তে কোম্পানি জীবাণুনাশক হিসেবেও গ্লাইফোসেটের পেটেন্ট নিয়েছে এবং একে ঔষধ বলা হয়েছে। পেটের ভিতরে থাকা অসংখ্য জীবাণু নিয়ে পাট মাইক্রোবায়োম মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি, মানসিক স্থিতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। জীবাণুরা সিকিমেট পদ্ধতিতে প্রোটিন তৈরি করে। উদ্ভিদ ও ছত্রাক এইভাবে প্রোটিন তৈরি করে। গ্লাইফোসেট ওই প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। পেটের উপকারী জীবাণু—ল্যাকটোব্যাসিলাস ও ব্যাসিলাস জীবাণুকে মেরে ফেলে। একে বলা হয় সিলিয়াক রোগ। পেটের অণুজীবের অসাম্যের কারণে মানুষের নানা ধরনের রোগা হয়। মানুষের শরীরের লোহা, মেলিবডেনাম, তামার অভাবের সঙ্গে বেশ কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব দেখা দিচ্ছে। মলিবডেনাম কোষের মাইটোকনড্রিয়ার কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শরীরে ইনসুলিন উৎপাদনে অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লাইসিনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্লাইফোসেটের মধ্যে গ্লাইসিনের অনুরূপ অণু রয়েছে। খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করার পর ওই গ্লাইসিন অণু শরীরের আসল গ্লাইসিনকে প্রতিস্থাপিত করে ইনসুলিন উৎপাদনে বাধা প্রদান করে (Pesticide-Induced Diseases, https://www.beyondpesticides.org/resources/pesticide-induced-disease-database/diabetes)।

ফোলেট বা ফলিক অ্যাসিড মানবদেহের শরীরে জীবাণুরা সিকিমেট পদ্ধতিতে ভিটামিন বি-৯-এর প্রাকৃতিক রূপ কোলেট তৈরি করে। এই ফোলেটই শরীরে লোহিত কণিকা গঠন করে। এর অভাবে রক্তাল্পতা হয় বিশেষত গর্ভাবতী মায়েদের খুব প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় ফোলেটের অভাব হলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা (Neural Tube Defects) বেড়ে যায় (Neural Tube Defects,https://www.nebi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4486472)।

গ্লাইফোসেট এখানেও ফোলেট তৈরি বন্ধ করে দেয়। প্রাকৃতিকভাবে ফোলেটের উৎস হল সিম, বরবটি, ডাল ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতিতে বাইরের তৈরি ফোলিক অ্যাসিড বড়ি খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

অবশ্যা গ্লাইফোসেট ছাড়াও মদ্যপান ও বেশ কিছু ঔষধও ফোলেটের শোষণে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে কৃত্রিম বি-৯ ভিটামিন ফোলিক অ্যাসিড বাজারে এসেছে। চিকিৎসকরা প্রাকৃতিক ফোলেটের উৎস হিসেবে শাকসবজি, বিনস, লেবু, বেশ কিছু ফল খেতে না বলে ফোলিক অ্যাসিড খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। দেখা গেছে কৃত্রিম ফোলিক অ্যাসিডের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে।

আমরা গ্লাইফোসেট ও অন্য কৃষি বিষ সম্বন্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারি। যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁদের দৃষ্টি গোচরে আনা ও নিষিদ্ধ করার জন্য আবেদন জানানোর পাশাপাশি এইসব বিষয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া। গ্লাইফোসেট স্প্রে করা সম্ভাব্য খাদ্যদ্রব্য

এড়িয়ে চলে বিদেশের ডাল, সয়াবিন, চা ইত্যাদি। ইতিমধ্যে জার্মানি সহ মোট ১৩টি দেশ এই বিষ নিষিদ্ধ করেছে (Glyphosate:Calls to ban cancer-linked weedkiller in wales,https://www.bbc.com/news/uk-wales-55215291)।

শেষের কথা

ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ওই বিষ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইতালিতে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আমেরিকার পর সবচেয়ে বেশি উৎপাদনকারী দেশ হল চীন। কিন্তু চীনের সেনাবাহিনীর খাবারে জিনশস্য ও আগাছা প্রতিরোধক সয়াবিন নিষিদ্ধ। গ্লাইফোসেট স্প্রে করা খাবার দেওয়া হয় না। ভারতের চা বাগানে, রাবার বাগান ছাড়াও ও অন্যান্য ফসলের ব্যবহার হচ্ছে। রেল লাইনের পাশের আগাছা পরিষ্কার করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ স্প্রে করছেন। চুঁইয়ে চলে যাচ্ছে পাশের খাল বিলে সেখান থেকে খাদ্য শৃঙ্খলে। জমিতে বহু দিন থেকে যায়, জমি অনুর্বর করে দেয়। ২০১৮-র ৯ ফেব্রুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষি বিভাগ গ্লাইফোসেটের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। অনুমোদিত নয় এমন আগাছা প্রতিরোধক জিনশস্যে স্প্রে না করার জন্য। উল্লেখ্য ওই রাজ্যে জিনশস্য তুলোর ব্যাপক চাষ হয়। প্রতিবেশী রাজ্য তেলেঙ্গানাও (১১ জুলাই, ২০১৮) অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাঞ্জাব সরকার (২৩ অক্টোবর, ২০১৮) এর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ ২০১৯-এর ১৪ জুন সব কৃষি খামারে এর ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারত সরকারে গেজেট অনুযায়ী ২০১৮-এর ৯ আগস্ট ১৮টি কীটনাশক নিষিদ্ধ করার কথা বললেও গ্লাইফোসেটের উল্লেখ নেই। ভারতে আগাছা প্রতিরোধী জিএম সরিষার অবৈধ চাষের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ চলেছে। বলতে গেলে ভারতেও এই বিষ বিক্রির ব্যাপারে কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। তথ্য জানার অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য লেখককে দেননি। অর্থাৎ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজস্ব তথ্য নেই, কোম্পানির দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে।

তথ্যসূত্র :

১. কৃষি ভাবনা ও দুর্ভাবনা, অনুপম পাল, ২০২২, কলাবতী মুদ্রা

২. Poison Foods of North America, Tony Mitra, 2017, Online Book

লেখক প্রাক্তন অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (পি), কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: anupampaul99@gmail.com • M. 9432256490

সংবাদ : প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মারক বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী

আজ যখন বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বিপন্ন, সেই সময় অত্যন্ত সময়োপযোগী 'পরিবেশ রক্ষা করো'—এই আহ্বান দিয়ে কলকাতার বুকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বেলগাছিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সভার যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে ৫-৭ জানুয়ারি, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল আচার্য 'প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মারক বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী'।

মেলার শুরুতে সুন্দর এক পদযাত্রার শেষে 'বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা'-র মণ্ডপে ফিতে কেটে ৫ই জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মাননীয়া অধিকর্তা ড. ধৃতি ব্যানার্জী। মেলার সম্মানীয় অতিথি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ড. সুমিত্রা চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার মহাপাত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কলকাতা জেলার সম্পাদক শেখ সোলেমান বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণে মেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দাস জানান এই মেলায় ২৫টি বিদ্যালয় ও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় সমেত মোট ৭৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবনী মডেল অবশ্যই বিজ্ঞান মেলার প্রধান আকর্ষক। ঐতিহ্যমণ্ডিত এশিয়াটিক সোসাইটি, মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে সাড়া জাগানো সংস্থা ইসরো, ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ, ভারতীয় বন সর্বেক্ষণ, ভারতীয় উদ্ভিদ সর্বেক্ষণ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম, জাতীয় কলেরা ও অন্ত্র রোগ সংস্থা (NICED), ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার (ICAR) বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ এই মেলার উপযোগিতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। আবার তারামণ্ডল, দূরবীণে আকাশ দেখা, কুসংস্কার বিরোধী যুক্তিবাদী প্রদর্শনী, রান্নাঘরে বিজ্ঞান, হ্যাম রেডিও, বিবর্তনের ইতিহাস, খাদ্যে ভেজাল নির্ণয়ের মতো বিষয়গুলি মানুষের মনে কৌতুহল জাগায়। অভিনব 'ডগ শো' এই মেলাকে অন্য বিজ্ঞান মেলা থেকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

আর আছে বিজ্ঞানের রকমারি বইয়ের সম্ভার নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, বিজ্ঞান দরবার, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ ও দেজ-এর মতো বিখ্যাত সংস্থা। এছাড়াও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী নিয়ে মেলা কমিটির উদ্যোগে নির্মিত তথ্যচিত্রসহ সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ 'বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা'-র মণ্ডপে সাধারণের মননে নিশ্চয়ই আলোড়ন তুলেছে।

বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতে পরিবেশ নিয়ে কী ধরনের চর্চা হয় তা নিয়ে সেইসব জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শ্রী পার্থ বোস, শ্রী ফাল্গুনী চ্যাটার্জী, শ্রী শ্রীনিবাস, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্ত ও অধ্যাপক তপন মিশ্র প্রমুখরা। নদী নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্সে মিউজিয়াম-এর প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রী নটরাজ দাশগুপ্ত। শেষ দিনে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন লক্ষ্ণৌ-এর ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ফিশ জেনেটিক রিসার্চ-এর অধিকর্তা ড. উত্তম সরকার, আটারি-কলকাতা-এর অধিকর্তা ড. প্রদীপ দে, অধ্যাপক শান্তনু ঝা, অধ্যাপক শুভাশিস বটব্যাল ও ড.বি.কে. চাঁদ প্রমুখ।

প্রতিদিন মেলায় গড়ে প্রায় তিন হাজার দর্শনের সমাগম ঘটে। মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ গড়ে ওঠে।

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

রান্নাঘরের সবচেয়ে দামি মশলা জাফরান

কোনো বিজ্ঞাপনে এই লাইনটি দেখেছিলাম— 'এক চুটকি জাফরান খান, দেখুন কী উপকার পান'। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যান্সার প্রতিরোধক, মন ভালো করা, শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, ইত্যাদি উপকারের বিরাট লিস্টি দেওয়া ছিল সেখানে। অবশ্য ২০১৯ সালে বায়োমেডিসিন অ্যান্ড ফার্মাকোপ্যাথি জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গবেষকরা এইসব উপকারের স্বপক্ষেই তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তবে সেখানে এই কথাও উল্লেখ ছিল যে জাফরান রান্নাঘরের সবচেয়ে দামি মশলা। আজকের দিনেও কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা যখন শিকারাতে ডাল লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, তখন প্রায়ই দেখা যায় একটি ছোট নৌকো নিয়ে তাদের সামনে হাজির হচ্ছেন কোনো বিক্রেতা— সঙ্গে থাকা কৌটোটি সযত্নে খুলে পর্যটকদের দেখাচ্ছেন কাশ্মীরের মহার্ঘ্য বস্তু 'জাফরান'। লালচে শুষ্ক তন্তুগুলি যে একেবারে 'জেনুইন' সে ব্যাপারে বারবার আশ্বস্ত করছেন ক্রেতাকে।

কাশ্মীরে জাফরান ফুল সংগ্রহ করা হচ্ছে

শ্রীনগর থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক গেলেই ঝিলম নদীর পূর্বতীরে ছোট্ট জনপদ পাম্পোর। টিনের চালাতে রোদের ঝলকানি, ছোট বাড়িঘর, দোকানপাট, বাজার, ইত্যাদি পেরিয়েই চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি মাঝে মাঝে উঁচু ঢিবি। ধূসর বাদামি রঙের এই জমিতে সারাবছর তেমন চাষবাস হয় না। তবে শরৎকাল আসতেই যেন বদলে যায় সবকিছু। নভেম্বর মাস নাগাদ এই জমি ভরে যায় বেগুনি রঙের ফুলে। দূর থেকে মনে হয় যেন বেগুনি রঙের অতিকায় কার্পেটে ঢেকে গেছে গোটা এলাকা। লিলি জাতীয় ফুলের গাছ। এগুলোই জাফরান ফুল, যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্রোকাস স্যাটিভাস। প্রাজাতিগত ভাবে এরা 'স্টেরাইল ট্রিপ্লয়েড', অর্থাৎ কোষে তিনটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের সেট থাকে। এদের বীজ হয় না। মাটির নীচে থাকা কাণ্ড বা বাল্ব (এগুলিকে bulbo-tuber বলে) থেকেই গাছ হয়। ছোট বাদামী বর্ণের বাল্বগুলি প্রায় দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত এবং অনেকটা রসুনের মতো দেখতে। অক্টোবরের শেষ দিকে সেখান থেকে ১৫-১৬ ইঞ্চি লম্বা সরু সরু সবুজ পাতা গজায় এবং মাটি ফুঁড়ে ওঠা এক-দেড় ইঞ্চি লম্বা বোঁটায় (pedicels) ফুল ফোটে। প্রতিটি বাল্বে মিষ্টি সুবাসযুক্ত দুই থেকে পাঁচটি ফুল ফোটে। একটি ফুলে সাধারণত তিনটি করে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে। ফুলের লালচে বাদামি বর্ণের স্টিগ্মা বা গর্ভকেশর অংশই জাফরান হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। এক কেজি জাফরানের জন্য মোটামুটিভাবে দেড় লক্ষ ফুল দরকার। ভারতীয় বাজারে এর মূল্য কেজি প্রতি প্রায় তিন লক্ষ টাকা। পাম্পোরে প্রতি একর জমিতে দেড় থেকে দুই কেজি জাফরান উৎপাদিত হয়। গোটা এলাকার নিরিখে যা বছরে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি হাজার কেজি। প্রায় কুড়ি হাজার পরিবার এই জাফরান চাষের সঙ্গে যুক্ত। পাম্পোর উপত্যকা ছাড়া জম্মুর কিস্তোয়ার জেলাতেও কিছু পরিমাণ জাফরান হয়।

জাফরান গাছ ও ফুলের বিভিন্ন অংশ

সারা পৃথিবীতে হরেকরকম খাবারের ডিশ-এ এর কদর আছে। আমাদের দেশেও নানা ধরনের মিষ্টি, লাড্ডু, পানীয় ও মশলাদার খাবারে জাফরান ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণভারতীয় সংস্কৃতিতে পুজোর উপাচার হিসাবে ঘি, মধু, চন্দন ইত্যাদির সঙ্গে জাফরান ব্যবহারের চল আছে। কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিতেও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ব্যবহৃত জাফরানের ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশই রান্নাঘরের বাইরে।

কাশ্মীরে জাফরান ফুল সংগ্রহ করা হচ্ছে

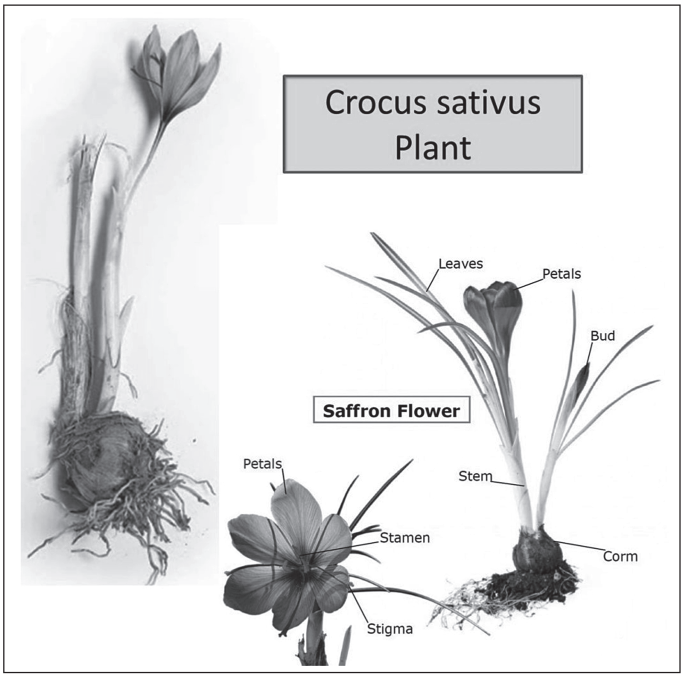

জাফরান গাছ ও ফুলের বিভিন্ন অংশ

তবে পৃথিবীতে খুব কম জায়গার মাটি ও আবহাওয়া এই জাফরান চাষের উপযুক্ত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সিরিয়ার কাছাকাছি ক্রোয়িকাস (বর্তমান Korghoz) অঞ্চলে প্রথম জাফরান ফুল দেখা গিয়েছিল। সে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার কথা। তারপর একসময় আরব বণিকদের হাত ধরে সেখান থেকেই এই গাছ গিয়ে পৌঁছোয় ইউরোপে। তবে কাশ্মীরের উপত্যকায় ঠিক কবে থেকে জাফরানের প্রবেশ ঘটেছিল বলা যায় না। খ্রিস্টীয় এগারশো শতকে কাশ্মীরি ঐতিহাসিক কলহনের লেখা রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে মশলা হিসাবে জাফরানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাম্পের-এ যৌথ পারিবারিক গঠনে অনেক পরিবারেই দশ থেকে পনেরো জন সদস্য থাকেন। তারাই নভেম্বরের মরসুমে জাফরান ফুল সংগ্রহের কাজ করেন। পারিবারিক শ্রম ছাড়া বাইরের শ্রমিকের সাহায্যে এই কাজ একরকম অসম্ভব। তাতে খরচ আরও উর্ধ্বমুখী হবে।

মহার্ঘ্য মশলা জাফরান

এবার কাশ্মীরে জাফরান চাষের কয়েকটি বিষয় আরেকটু ভালো করে জেনে নেওয়া যাক। ফুল ফোটার পর সূর্যোদয়ের আগেই এদের তুলে ফেলতে হয়। কারণ রোদ পড়লেই গর্ভকেশরের মায়াবী লালচে বাদামী বর্ণ ফিকে হয়ে যায়। অর্থাৎ ফুল তোলার জন্য ধার্য্য সময়

মহার্ঘ মশলা জাফরান

বেশ কম। সযত্নে একটি একটি করে ফুল তুলে সংগ্রহ করা হয়। এখানে কোনো মেশিনের ব্যবহার নেই। জাফরান চাষের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সব সদস্য ঐ সময় এই কাজে হাত লাগায়। ফলে প্রতি বছরের এই সময় প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা নিচু হয়ে এই ফুল সংগ্রহ করতে হয়। এতেই শেষ নয়; এবার ফুলের গর্ভকেশরগুলিকে পুংকেশর ও অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করার কাজটিও হাতেই করতে হয়। জাফরানের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য খেয়াল রাখতে হয় গর্ভকেশরের সঙ্গে যেন এতটুকুও অপ্রয়োজনীয় কিছু না থাকে। এর পরের ধাপে সংগৃহীত তন্তুগুলিকে (সুতোর মতো গর্ভকেশর) প্রয়োজনমত শুষ্ক করা হয় যাতে বর্ণ ও গন্ধ সংরক্ষিত থাকে। এই প্রক্রিয়াকে 'ফিক্সিং' বলে। ইউরোপে সামান্য উত্তাপ প্রয়োগে ফিক্সিং করা হলেও কাশ্মীরে সনাতন পদ্ধতিতে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়। রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ, সেচব্যবস্থা বা উন্নত কোনো প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কাশ্মীরের জাফরান চাষের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলি আজও সনাতন পদ্ধতিতেই এই মশলা উৎপাদন করে যাচ্ছেন। ফলে অনেক সময়ই সাংঘাতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তাদের। কাশ্মীর ছাড়া জাফরান চাষ হয় ইরানের মাসাদ-এর কাছাকাছি তোরবাদ-ই-হায়দারি অঞ্চলে। জমিতে তুলো, আখ ও বার্লির পাশাপাশি সেখানে এই চাষ করা হয়। তাছাড়া স্পেন, ইতালি, গ্রীস, আফগানিস্তান, জাপান, ইত্যাদি দেশেও জাফরান পাওয়া যায়। গোটা বিশ্বের নিরিখে ইরানেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জাফরান উৎপাদিত হয়। তবে স্পেনে উৎপন্ন জাফরানের গুণগত মান নাকি সবচেয়ে ভালো। উন্নত দেশগুলিতে দৈহিক শ্রমমূল্য বেশি হওয়ার কারণেই হয়তো সেখানে জাফরান চাষ তেমন লাভজনক হয় না।

জাফরানে প্রায় ২৮ রকমের উদ্বায়ী সুগন্ধি পদার্থ থাকে, রাসায়নিক দিক থেকে যেগুলি সবই কিটোন বা অ্যালডিহাইড জাতীয় যৌগ। তবে এদের মধ্যে প্রধান যৌগটি হল স্যাফ্রান্যাল। তাছাড়া ক্রোসিন, ক্রোসিটিন এবং পিক্রক্রোসিনের মতো বেশ কিছু অনুদ্বায়ী ক্যারোটিনয়েড জাতীয় যৌগ উপস্থিত থাকে। এদের মধ্যে ক্রোসিটিন যৌগটি একটি ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড পলিইন এবং জলবিকর্ষী (হাইড্রোফোবিক) বলে সহজেই তেলে দ্রবীভূত হয়। তবে মশলা হিসাবে জাফরানের উজ্বল হলদে-কমলা বর্ণের জন্য প্রধান ভূমিকা হল আলফা-ক্রোসিন যৌগটির। তাছাড়া এতে উপস্থিত পিক্রক্রোসিন একটু তিতকুটে স্বাদ এবং তীব্র গন্ধের জন্য দায়ী। ফুলের গর্ভকেশর সংগ্রহ করে মশলায় রূপান্তরের সময় অর্থাৎ ফিক্সিং-এর সময় তাপ এবং উৎসেচকের প্রভাবে পিক্রক্রোসিন বিয়োজিত হয়ে D-গ্লুকোজ এবং মুক্ত স্যাফ্রানল অণু উৎপন্ন করে। স্যাফ্রানল ছাড়া জাফরানের সুগন্ধের জন্য দায়ী অপর উল্লেখযোগ্য পদার্থটি হল লেনিয়েরেন। জারফানে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিকগুলির মধ্যে অনেক পদার্থই বায়ুর অক্সিজেন এবং আলোর উপস্থিতিতে বিয়োজিত হয়ে যায়। তাই বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় সাবধানে এই মশলা সংরক্ষণ করা হয়।

আসলে জাফরান পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল, সবচেয়ে ব্যয়বহুল খাবার - ক্যাভিয়ার, ট্রাফলস, প্রিমিয়াম ভ্যানিলা বিন্স, আসল জাপানি ওয়াসাবি এবং অন্য যে কোনও বিলাসবহুল খাবারের চেয়ে বেশি মূল্যবান। আর ওজনের দিক থেকে এর বাজারদর সোনার চেয়েও বেশি!

জাফরান-এ উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ—

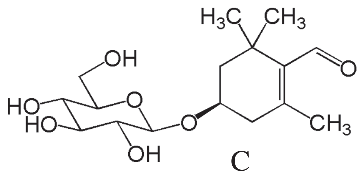

C D

ক্রোসিন ($C_{44}H_{64}O_{24}$, A) স্যাফ্রান্যাল ($C_{10}H_{14}O_7$, B), পিক্রক্রোসিন ($C_{16}H_{26}O_7$, C) এবং ক্রোসিটিন ($C_{20}H_{24}O_4$, D)

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

অ ম র কু মা র না য় ক

বিপন্নতার মুখে দুর্গাপুর ব্যারেজের জীবকুল

আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কথা উঠলে প্রথমেই দুর্গাপুর ব্যারেজের কথা আমার মাথায় আসে। আসলে দামোদর নদের দুই পাশই যেন জীববৈচিত্র্যের পসরা নিয়ে বসা এক বহমান বাজার। বারো বছরের বেশী সময় ধরে দামোদর সংলগ্ন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে একটা কথা উপলব্ধি করেছি দুর্গাপুর ব্যারেজে যখন তখন যেকোনো প্রাণীর দেখা মিলতে পারে। প্রায় প্রতি বছরই এখানে বেশ চমকপ্রদ ভাবে নতুন প্রাণীর সন্ধান মেলে। আর তখন আশপাশের এলাকায় থাকা জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে কৌতূহলী মানুষের আনাগোনাও বেড়ে যায়। এর ফলে এই এলাকা ভালোভাবে এক্সপ্লোর হচ্ছে। তবে আজ বছর তিন চারেক হল এখানকার প্রাণীদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলির উপর হাত পড়েছে মানুষের। মানুষের লোভের অন্ত নেই। সৌন্দর্য বিলাসী এবং প্রগতিশীল মানুষ উন্নয়নের নেশায় বুঁদ হয়ে ভুলেই গেছে প্রকৃতি সুন্দর হয় প্রাকৃতিক সজ্জায়। সুন্দর বাগানের থেকে আগাছাপূর্ণ ঝোপ-জঙ্গলে জীবজন্তুর আনাগোনা অনেক মাত্রায় বেশি। পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে সরকারও উদ্যোগী আর তাই যেখানেই মানুষের সমাগমের সুযোগ সেখানেই প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে তৈরি হচ্ছে সুসজ্জিত ইকো পার্ক! দুর্গাপুর ব্যারেজের যে অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, পোকা, প্রজাপতি, ফড়িং, সরীসৃপের সাথে ছোট স্তন্যপায়ীদের দেখা মিলত সেখানেই গড়ে উঠেছে একটি পার্ক। গত দু-বছর করোনা আবহে বন্ধ থাকার পর এই বছর (২০২৩) দেখছি হুজুগে মানুষের মেলা লেগে গেছে শীতের মরশুমের শুরুতেই। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ছুটে এসে জুটেছে। পিকনিক পার্টির ঢল, বক্স, ডিজে সব মিলিয়ে প্রাণীকুলের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব। যেসব পাখিরা দূর থেকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে এখানে এসে জোটে তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই উৎপাত অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে। আমরা যারা শীতের আগমনের সাথেই মুখিয়ে থাকি নতুন জীবের সন্ধানে তারাও পালিয়ে বেড়াচ্ছি শান্তির সন্ধানে। যাইহোক ফিরে আসি দুর্গাপুর ব্যারেজে দেখা প্রাণীদের কথায়। এখানে দেখা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পাখি। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের পাখির আনাগোনা দুর্গাপুর ব্যারেজের আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিমে। তবে কিছু পাখি এখানে প্রায় সারা বছর ধরেই দেখা যায়। দুর্গাপুর ব্যারেজের পাখিদের প্রসঙ্গে আলোচনার আগে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক এই দুর্গাপুর ব্যারেজের ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞান।

পৃথিবীর যেকোনো সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেসব গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা কেন্দ্রগুলিও কোন না কোন নদীর পাশেই গড়ে উঠেছিল। সমগ্র আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে দামোদর ও অজয় নদের অববাহিকা অঞ্চলে। এই দামোদর নদটি স্বভাবে বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপত পাহাড়ের (রাঁচী জেলা) সোনাজুড়িয়া প্রস্রবণ থেকে উৎপত্তি লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে পুরুলিয়া জেলাতে। সেখান থেকে আবার বাঁক নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দিসেরগড়ে প্রবেশ করে প্রধান উপনদী বরাকরের সাথে মিলিত হয়ে বাঁকুড়া-পশ্চিম বর্ধমান সীমা বরাবর বয়ে চলে রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর হয়ে বুদবুদ পেরিয়ে বর্ধমান শহর ছেড়ে শক্তিগড়ের কাছে হঠাৎ প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে প্রথমে হুগলি ও পরে প্রবেশ করেছে হাওড়া জেলায়। অবশেষে হাওড়া জেলায় পৌঁছে হুগলি নদীমুখে (নিম্ন গাঙ্গেয় নদী ব্যবস্থা) মিলিত হয়েছে। দামোদরের অন্যান্য উপনদীগুলি হল কোনার, গুয়াই, জামুনিয়া, উশ্রি, বোকারো, হাহারো, খাদিয়া, ভেড়া নদী। দামোদর, গাঙ্গেয় নদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত একটি নদী যা বর্ষার জলে পরিপুষ্ট হয়ে বয়ে চলেছে। নদীটির মোট বিস্তৃতি ৫৪১ কিলোমিটার যার মধ্যে ২৮৭ কি.মি. ঝাড়খণ্ডে এবং বাকি ২৫৪ কি.মি. পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের জলাকীর্ণ অঞ্চলের ব্যাপ্তি মোট ২৫৮২০বর্গ কিলোমিটার। এই নদীটির আশপাশের ভূপ্রকৃতি বেশ বৈচিত্রময়। দামোদরের উৎপত্তি অঞ্চল থেকে উপরের অংশে আছে উঁচু পাহাড়, মালভূমি, উচ্চভূমি এবং সমগ্র এলাকাই প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ; যদিও নীচের দিকের অংশ বেশ পলি সমৃদ্ধ ও উর্বর প্রকৃতির নিম্ন সমতলভূমি। পশ্চিমবঙ্গের দুই বর্ধমান, হুগলি জেলা ছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং হাওড়া জেলাতেও এই নদী অববাহিকার বিস্তৃতি। দামোদর নদী যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহরের পাশ দিয়ে গেছে সেগুলি হল— রামগড়, বোকারো, ধানবাদ, বরাকর, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এবং হাওড়া। দামোদর নামের বেশ কিছু তাৎপর্য পাওয়া যায়। যেমন দামোদর শব্দের একটি অর্থ পবিত্র জল যার সাথে যোগসূত্র রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের। আবার দামোদর শব্দের আরেকটি অর্থ যার উদরে আগুন। আসলে ভারতের মোট কয়লা ভাণ্ডারের মোট ৪৬% সঞ্চিত আছে দামোদর অববাহিকা অঞ্চলে। আর এই কারণেই একে 'স্টোর হাউস অফ ইন্ডিয়ান কোল' বলা হয়েছে। তবে শুধু কয়লা নয় এখানে আছে অভ্র, বক্সাইট, লাইমস্টোন, চাইনা ক্লে (কায়োলিনাইট), ফায়ার ক্লে (সেরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়), বারিটিস (বেরিয়াম সালফেট) এবং লৌহপাথর। আর এসবের টানেই প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় এখানে এসেছে ব্যবসায়িক কেন্দ্র স্থাপন করতে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠার সাথে সাথেই নানা স্থান থেকে মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছে দামোদরের অববাহিকায়। এভাবেই গড়ে উঠেছে আজকের এই বিশাল শিল্পাঞ্চল। তবে শুধু ব্যবসায়িক মহল নয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ভারত সরকারও এগিয়ে এসেছে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতি কল্পে। এই প্রসঙ্গে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'-এর কথা উল্লেখ করতেই হয়। দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতি প্রসঙ্গে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি.ভি.সি.) সম্পর্কে

একটি কথা প্রযোজ্য আছে 'DVC turned it from River of Sorrow to River of Opportunities'। এখানকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক আলোচনার পূর্বে একটু জেনে নেওয়া যাক দামোদর ভ্যালিতে ডি.ভি.সি. প্রকল্পের বাস্তবায়নের ইতিহাস সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদ নদীর মধ্যে অতীত থেকেই দামোদর অতি পরিচিত মূলত দুটি কারণে। প্রথমটি হল এই নদীর প্রাচীনত্ব (বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এমনটাই জানা গেছে) আর অন্যটি এই নদী অববাহিকায় ঘটে যাওয়া বন্যার তান্ডব। দামোদরের উচ্চভূমিতে প্রবল বর্ষণের ফলে ধেয়ে আসে জলোচ্ছ্বাস আর এতেই দামোদর অববাহিকা বারে বারে ভেসে গেছে বন্যায়। দামোদর ভ্যালিতে ১৭৭০ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে মোট ষোলোবার বন্যা হয়েছে আর প্রতিবারেই বিপন্ন হয়েছে জনজীবন। নষ্ট হয়েছে অগণিত সম্পত্তি। দামোদরের পাড়ের ভাঙন গ্রাস করেছে দামোদর অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের জমি, ঘর, বাড়ি। তবুও এই অববাহিকা ছেড়ে যায়নি এখানে বাস করা মানুষ। নিজের ভিটে থেকে উৎখাত হয়েও ফের বসতি স্থাপন করেছে এখানেই। ১৯৪৩ সালের বন্যায় সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয় এই অঞ্চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময় বন্যার তোড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে ত্রাণ, ওষুধ পৌঁছাতে বাধা তৈরি হয়। আর এর পরেই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসে এবং দামোদর নদের বন্যা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন বিশিষ্ট পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহা এবং বর্ধমানের মহারাজার তত্ত্বাবধানে। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার 'টেনসি ভ্যালি কর্পোরেশন'-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক ভুরডুইন সাহেবকে ভারতে পাঠান ১৯৪৪ সালে। এরপর তিনি সরেজমিন তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি দামোদরের উচ্চ এবং নিম্ন অববাহিকায় নদীর উপর আটটি বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের সুপারিশ দেন। এর মাধ্যমে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয় সাথে প্রতিটি জলাধারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং একটি উইয়ার নির্মাণ করে সেচের প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য প্ল্যান তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হিসাবে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' আত্মপ্রকাশ করলেও ভুরডুইন সাহেবের সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়িত হয় বিভিন্ন বাধার কারণে। এই প্রকল্পের অধীনে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেতে মোট চারটি বাঁধ ও জলাধার তৈরি করা হয় এবং দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর ৬৯২মিটার দীর্ঘ ব্যারেজ বা আড়বাঁধের নির্মাণ। এই ব্যারেজ জেলাগুলির সংযোগ রক্ষাকারী সেতুর কাজও করে চলেছে সেই জন্মলগ্ন থেকে। ১৯৭৮ সালের বন্যায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ও ধ্বংসের ভয়াভয়তা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যায় এবং ডি.ভি.সি প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যদিও সমগ্র ভ্যালিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন (জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ) এবং সেচের প্রভূত উন্নতি (দামোদরের উপর রন্ডিয়ায় একটি উইয়ার নির্মাণের মাধ্যমে এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেটের দুই দিকে দুটি সেচের ক্যানেল নির্মাণ করে) সাধন করে এলাকার বিকাশে ডি.ভি.সি-র গুরুত্ব অপরিসীম। দামোদরের বন্যার মূল কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল অতিরিক্ত জল নয়, অতিরিক্ত বালি বয়ে এনে মধ্য- ও নিম্নভূমিতে জমা করা। এই অতিরিক্ত বালি ও পলি সঞ্চয়ের ধারা আজও চলছে দামোদরে। আর এই কারণেই দেখা গেছে হুগলি নদীমুখে মিলিত হওয়ার আগে দামোদর বারে বারে পথ পরিবর্তন করেছে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে। দামোদরের উপর এতগুলি বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করে প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে আটকানো হলেও খুব একটা লাভ হয়নি কারণ এখনও বর্ষায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে নিম্নভূমিতে প্লাবন দেখা যায় যার ভয়াভয়তা কম হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য নয়। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজল ঘাঁটির কাছে দামোদরের শাখানদী শালি নদীর গতিপথ আজ অবরুদ্ধ। এখানেও একটি বাঁধ নির্মাণ করে নদীকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে মরণ ফাঁসে। যদিও বর্ষায় এটি ফেঁপে ওঠে। ডি.ভি.সি. প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং অপরিকল্পিত ভাবে বাঁধ নির্মাণের ফলে এখনও বর্ষায় দামোদর ফুলে ফেঁপে ওঠে আর নিম্নভূমির বহুলাংশ প্লাবিত হয়, আবার অন্যদিকে গ্রীষ্মে একেবারে জল শুকিয়ে যাওয়ায় প্রবল জলকষ্টের কারণ হয়। দামোদরের জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমান (একাংশ) জেলার বহু মানুষ। তাই সব মিলিয়ে দামোদরকে এখন আর 'দুঃখের নদ' বলা না গেলেও তার বালক সুলভ খামখেয়ালীপনা এখনও বহু মানুষের জীবন যুদ্ধের কারণ। প্লাবনের পর দামোদরের নিম্নভূমিতে সঞ্চিত পলি এখানকার জমিকে চাষবাসের উপযোগী করে তুলেছে। আর এখানকার সেচ খাল ও জলাধার মাছ চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তাই দামোদর নদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা শুধু প্রাকৃতিক ভাবে নয় আর্থ-সামাজিক আঙ্গিকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপুর ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিমে বর্ষা ছাড়া অন্য সময় জল কমই থাকে। বর্ষার পর জল কমে গেলে সঞ্চিত পলি ও কাদায় পোকাদের খেতে আসে বিভিন্ন প্রান্তের পাখি। আর তাই দুর্গাপুর ব্যারেজের আপস্ট্রিম ও ডাউনস্ট্রিম নানান পাখির আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জলচারী পাখিদের বৈচিত্র্য তাক লাগানোর মত। শুধু পাখি না, অন্যান্য বিভিন্ন জীবের সম্ভার এই ব্যারেজ। আর এসব নিয়েই এই প্রবন্ধের আলোচনা।

দামোদরের দুই পাশে প্রচুর মানুষের বাস। তবে মাঝেমধ্যে এখানে বেশ জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল এখনও থেকে গেছে। এছাড়াও দামোদরে এসে পড়া সিঙ্গারন বা নুনিয়া জলধারার আশেপাশেও প্রচুর জঙ্গল ও বন্যপ্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আমাদের আলোচনা যেহেতু দুর্গাপুর ব্যারেজের বন্য জীবনকে কেন্দ্র করে তাই সেই অঞ্চলের সম্পর্কে দু চার কথা বলতেই হয়। দুর্গাপুর ব্যারেজের আপস্ট্রিমের মাঝে মাঝে চর এবং ক্যানেলগুলির বেশীর ভাগ অংশই কচুরিপানা এবং নানান গুল্ম জাতীয় গাছে ও আগাছায় ভর্তি। এইসব জলাকীর্ণ অঞ্চলে বেশ কিছু পাখির সন্ধান সারা বছর পাওয়া যায় যেমন কটন পিগমি গুস (বালি হাঁস), ব্রোঞ্জ-উইংড জ্যাকানা (জলপিপি), ফিজেন্ট-টেইলড জ্যাকানা (জলময়ূর), কমন মূর হেন (জল মুরগি), হোয়াইট-ব্রেস্টেড ওয়াটার হেন (ডাহুক), লিটিল কর্মোরেন্ট (ছোট পানকৌড়ি), ইন্ডিয়ান পন্ড হেরন (কোঁচ বক), লিটিল এগ্রেট (ছোট কোর্চে বক), ক্যাটেল এগ্রেট (গো-বক)। এছাড়াও দেখা

যায় বিভিন্ন মাছরাঙা, পার্পেল হেরন (লাল কাঁক), গ্রে হেরন (সাদা কাঁক), গ্রেটার কর্মোরেন্ট (বড় পানকৌড়ি), লেসার হুইস্লিং ডাক (সরাল), রাডি শেলডাক (চখাচখী)। এসব জলচারী পাখিদের ছাড়াও নদীর জলের চরে দেখা মেলে লিটিল-রিংড প্লোভার (জিরিয়া), কেন্টিস প্লোভার (কেন্টিসের

জিরিয়া), ল্যাপউইং (হাটিটি), স্নাইপ (কাদাখোঁচা), স্মল প্রেটিনকোল (বাবুই বাটান), ব্ল্যাক-উইংড স্টিল্ট (লাল ঠ্যাঙি), স্যান্ড লার্ক (ভরত), বিভিন্ন ধরণের বাটান (স্টিন্ট ও স্যান্ডপাইপার), খঞ্জনা (ওয়েগটেল) প্রভৃতির। এদের ছাড়াও বার্ন সোয়ালো (মেঠো আবাবিল), ওয়ের-টেইলড সোয়াল (তারল্যাজা), স্ট্রিক-থ্রোটেড সোয়ালো, লিটিল সুইফট (হাওয়াশীল), অ্যাসি উড সোয়ালো, এশিয়ান পাম সুইফট (তাল চাতক), গ্রে-থ্রোটেড মার্টিন (নাকুটি), গ্রিন বি-ইটার (বাঁশপাতি), ব্লু-টেইলড বি-ইটার (নীল-লেজ বাঁশপাতি), রেড মুনিয়া (লাল মুনিয়া), ট্রাই-কালার্ড মুনিয়া (শ্যামসুন্দর), চেস্টনাট মুনিয়া এবং ইন্ডিয়ান সিলভারবিল (সর মুনিয়া) প্রভৃতি। এছাড়াও পাতিকাক, ফিঙে সহ বিভিন্ন ধরণের শালিক পাখি দেখা যায়। আশেপাশের মাঠে দেখা যায় গ্রে ফ্রাঙ্কোলিন (ধূসর তিতির) এবং কালো তিতির (ব্ল্যাক ফ্রাঙ্কোলিন) দেখার রিপোর্ট আছে। বর্ষায় প্রচুর সংখ্যায় শামুক খোল (এশিয়ান ওপেনবিল) এর সাথে বাজকা (ব্ল্যাক-ক্রাউন্ড নাইট হেরন), বলাকা (গ্রেট এগ্রেট), কালো বক (ব্ল্যাক বিটার্ন), হলদে বক (ইয়েলো বিটার্ন) এবং জ্যোৎস্না বক (সিনেমন বিটার্ন) দেখা যায়। আশেপাশের ঝোপঝাড়ে ভেসে আসে ওয়ের্বলার (পাতা ফুটকি) এবং অন্যান্য পতঙ্গভুক পাখিদের। উঁচু ডালে ঘুঘুদের সাথে প্রায়ই চোখে পড়ে হরিয়াল (ইয়েলো-ফুটেড গ্রিন পিজন), বেনেবৌ (ব্ল্যাক হুডেড ওরিয়ল), সোনাবৌ (গোল্ডেন ওরিওল), বসন্ত বৌরি (কপারস্মিথ বারবেট), সোনালি কাঠঠোকারা (ব্ল্যাক-রাম্পড ফ্লেমব্যাক) প্রভৃতির। এখানেই ২০২২-এর বর্ষায় দেখা পেয়েছিলাম কমন টার্ন এবং পালাস গাল পাখিদের। ২০২৩-এ দেখা মিলেছিল ইউরেশিয়ান কার্লিউ (বড় গুলিন্দা) পাখির। এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান শিকারি পাখিদের দেখা যায় যেমন সোনালি চিল (ব্ল্যাক কাইট), কাপাসি চিল (ব্ল্যাক উইংড কাইট), মৌবাজ (ওরিয়েন্টাল হানি বাজার্ড), ওয়েস্টার্ন মার্স হ্যারিয়ার, তিলাজ বাজ (ক্রেস্টেড সার্পেন্টি ঈগল), পোকামার (কমন কেস্ট্রেল), রেড-নেকড ফ্যালকন, পেরিগ্রিন ফ্যালকন প্রভৃতির। এছাড়াও এখানে

মদনটাক (লেসার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক) এবং মানিকজোড়ের (উলি-নেকড স্টর্ক) পাখির দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। ব্যারেজের কাছাকাছি বড় গাছগুলিতে থাকে খুঁড়লে প্যাঁচা (স্পটেড আউলেট)। নানান ধরণের গাইয়ে পাখি যেমন পাপিয়া (কমন হক কাক্কু), বর্ষাপ্রিয় (প্লেন্টিভ কাক্কু), চাতক (পায়েড ক্রেস্টেড কাক্কু) প্রভৃতির দেখা মেলে এখানে। পাখিদের এই বিবরণ থেকে বোঝাই যাচ্ছে ঋতুভেদে বিভিন্ন ধরণের পাখির আগমনে নানান রঙের পালকে সেজে ওঠে দুর্গাপুর ব্যারেজ চত্বর।

পাখি ছাড়াও এই অঞ্চল থেকে বেশ ভালো সংখ্যায় শেয়াল (গোল্ডেন জ্যাকেল) পাওয়া যায়। তাছাড়াও খেঁকশিয়াল (বেঙ্গল ফক্স) দেখা গেছে। বিভিন্ন সরীসৃপেরও এক সময় বেশ ভালোই দেখা মিলত। আর শুধু তাইই নয় ব্যারেজের জলে বেশ কিছু দেশীয় মাছ পাওয়া যায় যাদের সংখ্যা বেশ দ্রুততার সাথে হ্রাস পাচ্ছে। এখানে যেসব পতঙ্গ পাওয়া যায় তার বৈচিত্র্য বেশ নজরকাড়া, এই প্রসঙ্গে ফড়িং এবং প্রজাপতির বিভিন্নতা বলতেই হয়। তবে আজ বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় জর্জরিত দামোদর নদ আর সেই সঙ্গে বিপাকে পড়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজও। আর তাই অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়েছে সেখানে বাস করা বিভিন্ন জীবেরও। প্রায় সবকটা সমস্যাই মানুষের তৈরি আর দুঃখের কথা সেই সমস্যা থেকে বেরনোর উপায় আমাদের হাতে নেই। কিন্তু তবুও চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই তাই উপায় খোঁজার আগে জেনে নেওয়া যাক দামোদরের এবং ব্যারেজের দুর্দিনের কারণগুলি।

এই নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বনাঞ্চল এবং বিভিন্ন জীবের বাসের উপযুক্ত অঞ্চল শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে থাকা সব বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান জনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও এখানে মানুষের হস্তক্ষেপ বেড়ে গেছে অনেকাংশেই। নদীর উপর বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ কাজ

চালানোর জন্য এখানে থাকা প্রাণীদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও আছে এখানে চোরা শিকারিদের উপদ্রব। চোরা শিকারিরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বিশেষ করে শীতের শুরুতে এখানে যখনই পরিযায়ী হাঁসদের আনাগোনা বেড়ে যায় তখনই এরা নানান উপায় অবলম্বন করে পাখি শিকার করে। শিকার করে সেসব পাখির মাংস সামনের বাজারে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে। এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলার আছে। এরা শিকার করার জন্য বিষের টোপ দেয়। বছর দশ পনেরোর বেশ কিছু বাচ্চাদের এসময় দেখা যায় নদীর ধারে হাতে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে ঘুরতে। এরা ফড়িং ধরে তাদের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয় আর সেটিকে টোপ বানিয়ে বিভিন্ন পাখিদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে এবং শিকার বানায়। এছাড়াও আছে ঘুনি জাল পেতে শিকারের পন্থা। তবে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বনবিভাগ ও স্থানীয় প্রসাশন সক্রিয় হয়ে হস্তক্ষেপ করায় এখন আগের থেকে অনেক কম চোরা শিকারের রিপোর্ট

পাওয়া যাচ্ছে। আশেপাশের কারখানা ও বসতি থেকে বয়ে আসা নোংরা এবং রাসায়নিক বর্জ্য নদীর জলে মিশে যাওয়ায় জল দূষিত হচ্ছে। আর তাই এখানে আগের থেকে অনেক কম পোকামাকড় দেখা যায় আর সেই সঙ্গে মাছের সংখ্যাও কমছে। আমাদের অলক্ষ্যে অনেক দেশীয় মাছই হারিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। মাছ ও পোকার সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে পাখিদের মধ্যে। এই কারণেও পরিযায়ী পাখিরা সংখ্যায় কম আসছে। এছাড়াও পিকনিকের সময় শব্দ দূষণ একটি কারণ পাখিদের ও অন্যান্য বন্য জন্তুদের দূরে সরানোর। দুর্গাপুর ব্যারেজ অঞ্চলের জীবদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবার স্থানীয় প্রশাসন, বনবিভাগ এবং 'ওয়াইল্ডলাইফ ইনফর্মেশন অ্যান্ড নেচার গাইড সোসাইটির' সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে বলতে হয় স্থানীয় মানুষ এবং নদীতে যাদের জীবিকা তারা এগিয়ে এলে এই সমস্যা সমাধানের সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে অনেকাংশে। এখনও দামোদরের পার্শ্ববর্তী যেসব এলাকাগুলি মানুষের হস্তক্ষেপের বাইরে আছে সেসব সুরক্ষিত করতে এবং সর্বোপরি দামোদরকে বাঁচাতে হবে নিজেদের তাগিদে। দামোদরের বিভিন্ন অঞ্চলে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে সেসব বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে নইলে এই নদী অকাল মৃত্যুর কারণ হবে। দামোদরে এ ধরনের ঘটনা আজকের নয়। প্রায়ই শোনা যায় নদীতে স্নান করতে নেমে চোরা বালিতে তলিয়ে যাওয়ার দুর্ঘটনার খবর। একদিকে যেমন সতর্ক হতে হবে নদীতে আসা মানুষদের অন্যদিকে এই বালির অবৈধ কারবারকে কড়া হাতে রুখতে হবে। নদী চুরির ঘটনা বেশ কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম তখন ব্যাপারটা না বুঝলেও এখন বুঝি। নদীর পাড় দখল করে মানুষ বসতি স্থাপন করছে আর এতেই নদী হারাচ্ছে নিজের পাড়, নিজের প্রাকৃতিক সীমাসাধক বাঁধ। নদীর পাড়কে মজবুত বানাতে পারে গাছ। তাই নদীর পাশে পাশে গাছ লাগানো দরকার। এতে যেমন নদী এবং নদী সংলগ্ন এলাকাবাসী সুরক্ষিত থাকবে তেমনি আশপাশের বন্যজীবন ফিরে পাবে প্রাণের স্পন্দন। আসুন না আমরা সকলে চেষ্টা করি আমাদের গর্বের দামোদরকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর।

লেখক বিদ্যালয় শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: amarnayak.stat@gmail.com • M. 8001467741

ড. শতাব্দী দাশ

এক অদ্ভুত দর্শন প্রাণী : টেপির

পৃথিবীতে কত যে অদ্ভুতদর্শন প্রাণী আছে আমরা সবাই তা জানিই না। তবে তাদের কথা জানতে আমাদের খুব কৌতুহল হয়। এইরকমই এক অদ্ভুতদর্শন প্রাণী হল 'টেপির'। শূকরের চেহারার সঙ্গে এদের খুবই মিল আছে। তবে টেপিরের আছে লম্বা মতো নাক, মনে হয় যেন হাতির 'শূঁড়' তৈরি হতে গিয়েও হয়নি। এদের দেখা যায় প্রধানতঃ দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বহু আগে উত্তর আমেরিকায় এরা বিচরণ করত কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১২০০০ বছর আগে ওই অঞ্চল থেকে এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে চার ধরনের টেপির দেখতে পাওয়া যায়। এরা হল দক্ষিণ আমেরিকার টেপির, মালয়ের টেপির, বেয়ার্ডস বা মধ্য আমেরিকার টেপির এবং পার্বত্য টেপির। এই প্রজাতিগুলির বৈজ্ঞানিক নামগুলি হল Tapirus terrestris– Tapirus indicus; Tapirus bairdii-এ, Tapirus pinchaque। এই চার প্রজাতির টেপিরই কিন্তু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর তালিকাভুক্ত (IUCN এর Red list)।

কেমন দেখতে এদের?

এদের দেখতে কেমন সেকথা একটু বলি। লম্বায় এরা প্রায় ২ মিটার বা ৬.৫ ফুট, উচ্চতা ১ মিটার বা ৩.৫ ফুট। এদের চোখ বাদামী, অনেক সময় একটু কালচে ভাব থাকে। গায়ের লোম ছোট ছোট, রঙ হয় লালচে বাদামী থেকে ধূসর, প্রায় কালো। পার্বত্য টেপিরের গায়ে উলের মতো 'ফার' থাকে। কান হয় ডিম্বাকৃতি। এদের লম্বাকৃতি নাক বা Proboscis টিকে এরা সবদিকে ঘোরাতে পারে।

৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এরা প্রজননক্ষম হয়। দুবছর অন্তর একেকবারে একটি বাচ্চার জন্ম হয়। গর্ভকালীন সময় প্রায় ১৩ মাস। এরা একা থাকতেই পছন্দ করে।

এদের বাসস্থান আর স্বভাব কেমন?

টেপিরের বাসস্থান মূলতঃ শুকনো অরণ্য, তবে গ্রীষ্মে নদীতে শরীর ডুবিয়ে রাখতে ভালোবাসে। এরা প্রধানত নিশাচর, তবে পার্বত্য টেপির দিনের বেলায় বেশি সক্রিয় থাকে।

টেপির সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৯৯৮ সালে। কোস্টারিকার করকোভাডো জাতীয় উদ্যানে এই প্রকল্পে টেপিরদের 'রেডিও কলার' পরিয়ে তাদের বাসস্থান এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

টেপির সাধারণত শান্ত প্রকৃতির হয়, তবে অনেকসময় মানুষকে আক্রমণ করে।

এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন?

প্রধানত তিনটি কারণে টেপিরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কারণগুলি হল :

১) মাংসের জন্য এদের শিকার করা,
২) রাস্তা তৈরি ও চাষাবাদের জন্য তাদের বাসভূমি নষ্ট হওয়া,
৩) সংরক্ষিত এলাকায় (অরণ্যে) চাষিদের দখলদারি এবং বসবাস।

ট্রপিক্যাল বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় টেপিরের অবদান রয়েছে। তাই তাদের বলে 'Umbrella species'। কারণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট যে বাসভূমি, সেখানে আরও অনেক প্রাণী বাস করে, যেমন— বনবিড়াল, হনুমান, হরিণ, বিভিন্ন পাখি ও সরীসৃপ। এরা (টেপির) বিভিন্ন ধরণের ফল খায়, ফলে এদের মাধ্যমে ওই সব ফল গাছের বীজ ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়। তবে মানুষের কারণেই এদের বাসভূমির ক্ষতি হয়। জলজ আগাছাও এদের খাদ্য। ভালো সাঁতারু এরা।

বিজ্ঞানীরা তাই নানাভাবে চেষ্টা করছেন কীভাবে টেপিরদের আরও অনেকদিন পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং তাদের অবলুপ্তি ঠেকানো যায়।

লেখক বিজ্ঞানী, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানকর্মী
email: satabdidas1965@gmail.com • M. 9875483121

বি কা শ চ ক্র ব র্তী

একিলিস ও কচ্ছপের গল্প

সে বহুদিন আগেকার কথা। একবার একটি কচ্ছপ গ্রীক বীর একিলিসের (Achilles) সাথে তর্কে জড়িয়ে পরে। গ্রীকবীর ছিলেন শক্তিশালী যোদ্ধা এবং সেই সময়ের দ্রুততম মানুষ। ওদিকে কচ্ছপ ছিল ধীরগতির প্রাণী।

সেই কচ্ছপ তর্কের সময়, একিলিসকে চ্যালেঞ্জ করে বলে ফেলে, "আমি তোমাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারি।"

"আমাকে?" গ্রীকবীর অট্টহাসিতে ফেটে পরেন, "পারবে? পারবে তুমি?"

"হে মহান গ্রীকবীর, আমি জানি, আপনি পরাক্রমশালী যোদ্ধা কিন্তু আমি পারব। তবে আমার একটা ছোট্ট শর্ত আছে।"

মায়া হল একিলিসের। ছোট্ট প্রাণী কচ্ছপ।

বেশ, বলো কী তোমার শর্ত?

উত্তরে কচ্ছপ মাথা দুলিয়ে বলল, "আমি জানি, আপনি আমার শর্ত মানবেন। আমি দৌড় শুরু করব, আপনার থেকে ১০ মিটার আগে। মানবেন এই শর্ত?"

"মাত্র ১০ মিটার।" উচ্চস্বরে হেসে উঠল এচিলিস, "তুমি নিশ্চিত হেরে যাবে। ঠিক আছে, আমি তোমার ইচ্ছে পূরণ করব।"

কচ্ছপ বলল, "আপনি মহান কিন্তু আমি জিতবই!

"বেশ, তাহলে শুরু হোক দৌড়!" একিলিসের কণ্ঠে বিদ্রুপ!

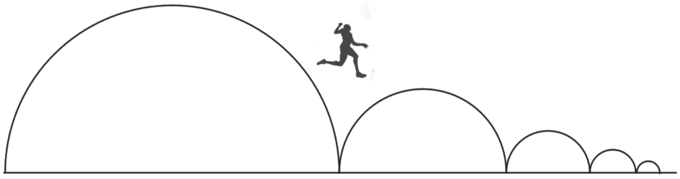

কচ্ছপ দশ মিটার আগে থেকে দৌড় শুরু করেছে

দৌড় শুরু হল। এচিলিস, দ্রুতগামী ব্যক্তি, কিন্তু কচ্ছপ ধীর পায়ে চলে। তবু দৌড় শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে একিলিস দশ মিটার দৌড়ে, কচ্ছপ যেখান থেকে দৌড় শুরু করেছিল, সেখানে চলে এল। কিন্তু ওই মুহূর্তকালের মধ্যেই কচ্ছপ কিছুটা এগিয়ে গেছে। সেই স্বল্প দূরত্ব যখন এচিলিস আবার দৌড়ে ফেলল, তখন সামনে তাকিয়ে দেখল, ধীরগতিতে চলা কচ্ছপ আরো একটু এগিয়ে গেছে।

একিলিস কচ্ছপের ফন্দী ধরতে পারল। কচ্ছপ যেহেতু ১০ মিটার আগে দৌড় শুরু করেছে, তাই এই দৌড় অনন্তকাল ধরে চললেও কোনদিনই একিলিস কচ্ছপকে হারাতে পারবে না।

একিলিস যত দ্রুতই দৌড়ে আসুক না কেন, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই কচ্ছপ আরো একটু এগিয়ে যাবে।

"সময় তো অখন্ড নয়, খন্ডে খন্ডে বিভক্ত!"

একিলিস কচ্ছপের বুদ্ধির কাছে হার মানল। কচ্ছপ দৌড়ে জিতে গেল।

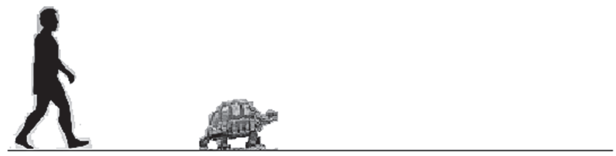

জেনোর প্যারাডক্স

উপরের এই গল্পটি প্রতীকি। গল্পটি জেনোর ধাঁধা (Zeno's Paradox) নামে পরিচিত। এই ধাঁধাটিকে এবারে অন্যভাবে বলা যাক। ধরা যাক, একজন অ্যাথলিট অনন্ত সময় ধরে লং জাম্প দিতে পারেন। কিন্তু পেশীর ক্লান্তির জন্য প্রথমবারে যতটা দূরত্ব লাফ দিতে পারেন, পরের বারে, প্রথমবারের অর্ধেক দূরত্ব লাফ দিতে পারেন। ধরা যাক, প্রথমবারে তিনি এক মিটার লাফ দিতে পারেন, তাহলে দ্বিতীয়বারে হাফ মিটার লাফ দিতে পারবেন, তৃতীয় বারে ১/৪ মিটার লাফ দিতে পারবেন। এভাবে যদি উনি ক্রমান্বয়ে লাফ দিতেই থাকেন, তাহলে দুই মিটার লাফ দিতে উনি কতটা সময় নেবেন? অথবা, কতবার লাফ দেওয়ার পরে উনি দুই মিটার দূরত্ব যেতে পারবেন?

সহায়ক তথ্য, রচনা ও গ্রন্থাবলী :

1. https://www.wikipedia.org

লেখক সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, রহড়া

email:bikash@rkmvcrahare.org • M. 9126270059

সংগঠন সংবাদ : ছবি

বাংলা আকাদেমিতে লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় বিজ্ঞান অন্বেষক

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা প্রকাশ

প ল্ল ব রা য় গু প্ত

রঙ চঙে বিজ্ঞান

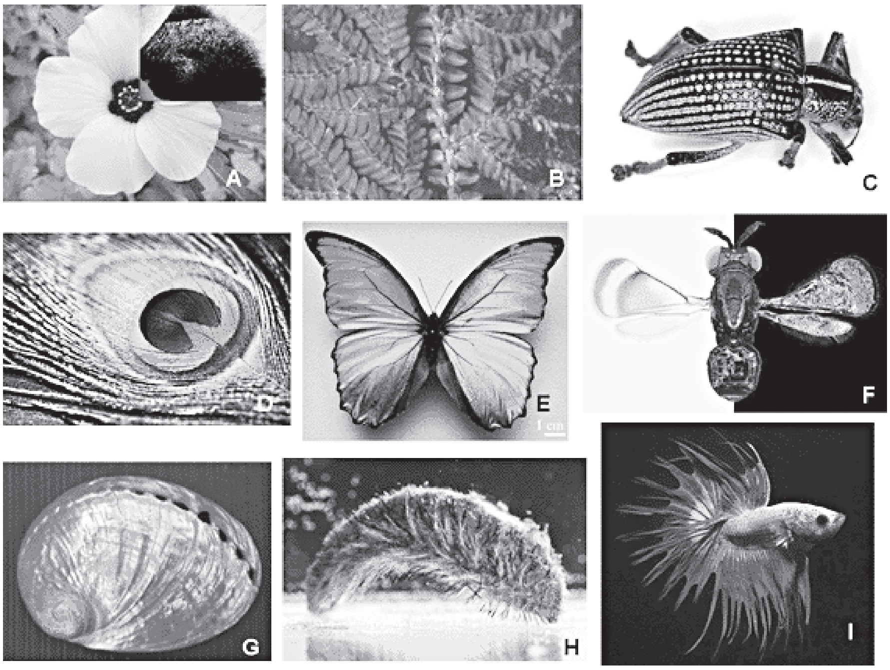

প্রকৃতিতে রঙের মেলা। চোখ ধাঁধানো রকমারি সব রঙ ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির আনাচে কানাচে। ময়ূরের পালক বা তার গলার উজ্জ্বল নীল রঙ দেখে আকৃষ্ট হয় না, এমন মানুষ বিরল। এই রকমই রঙের বাহার আমরা দেখি; গোলা পায়রার গ্রীবায়, প্রজাপতির পাখনায়, মাছির ডানায়, ঝিনুকের বুকে কিম্বা জবা ফুলের পাপড়িতে। এই রঙ চঙে সব প্রাণগুলো যেমন আমাদের বিস্মিত করে, তেমনই প্রশ্ন জাগায় মনে। ঠিক কিভাবে প্রকৃতিতে তৈরি হয় এমন মনোহরী সব রঙ?

রঙের উৎস বলতে আমরা মূলত দু-ধরনের প্রক্রিয়ার কথা জানি। এক হল সাদা আলো যাখন প্রিজম বা জলের ফোঁটার ভিতর দিয়ে যায় তখন তা ভেঙ্গে সাত রঙা রামধনু রঙ তৈরি করে। রঙের আদ্যক্ষরগুলো সাজিয়ে আমরা পাই **বে নী আ স হ ক লা,** যথাক্রমে : বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। আর এক ধরনের রঙ তৈরি হয় বিভিন্ন রাসায়নিকের সংমিশ্রণে। যাদের আমরা ইংরাজিতে pigments ও বাংলায় রঞ্জক বলে থাকি। এই রঞ্জকের উপস্থিতি প্রকৃতিতে রঙের প্রাচুর্যের এক অন্যতম কারণ। যেমন গাছের পাতা সবুজ হয় ক্লোরোফিল নামক রঞ্জকের কারণে। যদিও প্রকৃতির সব রঙ রঞ্জকের কারণে হয় না। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

মরাফো প্রজাপতির পাখনা দেখতে উজ্জ্বল নীল, আবার সেটি হাতে নিয়ে আলোর সামনে ধরলে তার আসল রঙ যে গাঢ় বাদামি তা সহজেই ধরা পড়ে যায়; তাহলে আমরা যে তাকে নীল দেখি, তার পিছনে ম্যাজিকটা কি? নোবেল জয়ী পদার্থবিদ সি ভি রমন লক্ষ্য করেন ময়ূরের পালক কিম্বা মরফো প্রজাপতির পাখনার রঙের পিছনে চলে বিজ্ঞানের অন্য খেলা। যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে গাঢ় উজ্জ্বল বাহারি রঙের দেখা মেলে সেইসব রঙ তৈরি হয় আলোর ব্যাতিচার বা interference এবং কিছুক্ষেত্রে বিচ্ছুরণ বা scattering এর ফলে। অর্থাৎ আমরা যা দেখি তা শুধুই আলোর ধাঁধা, যার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। রমন তাঁর গবেষণায় দেখালেন ময়ূরের পালক, প্রজাপতি বা মাছির ডানা ঝিনুক কিম্বা ফুলের পাপড়ির ত্বক বা আবরণ অসংখ্য সূক্ষ্ম আঁশের মত অংশ দিয়ে তৈরি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের আবরণের নীচে থাকে ছোট ছোট ছিদ্র বা হাওয়ার বুদবুদ। আলো যখন সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র হাওয়ার বুদবুদ বা আঁশের উপর পড়ে তা ভেঙ্গে যায় সাতটি রঙে। সেইসব বিশেষ আকারের জন্য অনেক সময় বড় তরঙ্গ দৈর্ঘের রঙগুলি আটকা পড়ে যায়, যেহেতু নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম তাই তা আটকা না পড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই আমাদের চোখে শুধু নীল রঙ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন প্রকৃতিতে নীল রঞ্জক বিরল আর তাই পৃথিবীতে যত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে এই ধরনের উজ্জ্বল নীল বা সবুজ রঙের দেখা মেলে তা সবই আলোর খেলা, এতে রঞ্জকের কোন ভূমিকা নেই। যেহেতু এই রঙ দেহের আবরণের বিশেষ আকারের জন্য তৈরি হয়, তাই বিজ্ঞানী রমন এই ধরনের রঙের নাম দিলেন structural colour বা আকারগত রঙ।

এখন প্রশ্ন হল, এত বাহারি রঙ চঙে সাজ এই সব প্রাণী বা উদ্ভিদদের কিভাবে সাহায্য করে? এটার উত্তর তো খুব সোজা। সুন্দর যে কোন কিছুই অন্যকে আকর্ষণ করে খুব সহজেই। ফুলের পাপড়ির গাঢ় উজ্জ্বল রঙ অন্যান্য পতঙ্গদের আকৃষ্ট করে আর তাতে পরাগরেণু এক এক ফুল থেকে আর এক ফুলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রজাপতি, মাছির ক্ষেত্রে তাদের রঙ, সঙ্গীদের আকর্ষণ করে আবার কখনো তা সাবধান করার কাজেও লাগে। কেননা এই সুন্দর রঙের আড়ালে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে

বিষ, যা তাদের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। সি ভি রমনের এই আবিষ্কার তৎকালীন বিজ্ঞানমহলে যথেষ্ট স্বীকৃতি না পেলেও আজ বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে তার বহুল প্রয়োগ ঘটছে।

১৯৩৪ সালে সি ভি রমন পাখির পালকের রঙের উৎস সন্ধান করে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। এই গবেষণাতেই প্রথম structural colour এর কথা জানা যায়। রমনের এই গবেষণা হয়তো সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়েছিল তাই তার তাৎপর্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা বহু বছর সময় নিয়েছেন। বর্তমানে bio-inspired photonics বা প্রকৃতি কিভাবে আলোকে কাজে লাগায় তার চর্চা চলছে বিভিন্ন জায়গায়। গবেষণায় উঠে আসছে দারুণ সব তথ্য, যা শুধু আমাদের অবাকই করছে না তার সাথে নতুন technology বানাতেও সাহায্য করছে। এরকমই কতগুলো উদাহরণ দেখে নেওয়ার আগে একটা বেশ মজার বিষয় বলি। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন ঝিনুকের বুকে যে সাত রঙা রঙ দেখা যায় তা কিন্তু বিশেষ বিশেষ কোণে বা angle-এ তাকালে ধরা পড়ে। আবার পায়রার গলায় যে চকচকে উজ্জ্বল রঙ তাও কিন্তু বদলে যায় সামান্য দিক পরিবর্তনে। প্রকৃতিতে এমন উদাহরণ রয়েছে ভুরিভুরি। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Iridescence বা পরিবর্তনীয় রঙ।

এমনই সমুদ্রের নীচে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা যাদের কলোনিগুলো চকচকে রামধনু রাঙা হয়। মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখা গেছে তাদের শরীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বচ্ছ তন্তুর মত অংশ দিয়ে তৈরি। তার উপর যখন আলো পড়ে তা প্রথমে সাত রঙে ভেঙে যায় আর তারপর আলোর তরঙ্গের উপরতিপাতের ফলে তৈরি হয় বিভিন্ন রঙ। বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে সেই রঙে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। তাদের অভ্যন্তরীণ বুনন এবং গঠনকে নকল করে বিজ্ঞানীরা বানাচ্ছেন জৈব রঙ এবং প্রসাধনী। চোখ ধাঁধানো এইসব রঙ পরিবেশের কোন ক্ষতি না করেই সৌন্দর্যায়নে সাহায্য করবে।

Structural colour এর সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণ হল হলোগ্রাম, যা আজকাল প্রায় সব বাজারজাত জিনিসেই চোখে পড়ে। একট বর্গাকার রূপালি ছাপ যাকে বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে দেখলে এক এক বারে একেক রকম রঙ ফুটে ওঠে। এতে উৎপাদনকারী সংস্থার লোগো এবং সীলমোহর থাকে। এই ধরনের হলোগ্রাম স্টিকার অসাধু ব্যবসায়ী বা নকল দ্রব্যের কেনাকাটি থেকে আমাদের বাঁচায়।

মারগারিটা নবিলিস নামের এক মেক্সিকান গাছের ফলের রঙ হয় একদম উজ্জ্বল নীল। এই ফলের ত্বকের রঙও তৈরি হয় তার আবরণের নীচের গঠনের কারণে। এই ফলের আভ্যন্তরীণ গঠন থেকে অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানীরা অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত স্বচ্ছ bandage তৈরি করে ফেললেন যার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। শরীরের কোন অংশ যদি ফুলে যায় তাহলে এই bandage-এ টান পড়ে যার ফলে তার আভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায় তার উপর আলো পড়লে বাকি সব রঙ আটকা পড়ে শুধু নীল রঙ বেরিয়ে আসে। যার ফলে bandage এর রঙ নীল হয়ে যায়। শরীরের আঘাত বা ফুলে যাওয়ার ইঙ্গিত পেলে এই ধরনের bandage আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা অ্যাম্বার এর মধ্যে আটকে থাকা প্রাণীদের রঙ পরীক্ষা করে সুপ্রাচীন যুগের গুবরে পোকা, বিভিন্ন পতঙ্গের দেহে structural colour এর হদিশ পেয়েছেন। তাদের দেহের উজ্জ্বল নীল ও সবুজ রঙ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের ধারা বোঝার কাজ করছেন। তার সাথে সাথে এইসব ফসিলের আভ্যন্তরীণ গঠনের ত্রিমাত্রিক আলোক বিশ্লেষণ করে জানা সম্ভব কয়েক হাজার বছর আগে সেইসব প্রাণীদের রঙ কেমন ছিল।

এছাড়াও ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লে, বা সব সময় শরীরে পরে থাকা যায় এমন ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেট, ক্যামফ্লাজ তৈরিতে এবং আভিনব প্রিন্টিং এর structural colour এর ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। প্রকৃতিতে তৈরি হওয়া এই আশ্চর্য সুন্দর রঙ এর আলোকে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান হয়তো আরও আলোকিত ও রঙিন হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান লেখক; আইআইটি, মাদ্রাজ

email:pallab.roygupta@shaastramag.iitm.ac.in • M. 9681021007

পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

মুখ্য পরিবেশক : রবি সাহা

২ নং ডেকার্স লেন, কলকাতা-৬৯

M. 9830389342 / 8961066724

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বুকস্টলে পাবেন।

হোয়াটঅ্যাপ : 7980121478

ডা. সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

গাছের মূল্য : ৫০ বছরে ৩ কোটিরও বেশি

শিরোনামটা দেখে অদ্ভুত মনে হতে পারে। ঘাবড়ে যাওয়ার মতই। একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে আগে বিষয়টা একটু আন্দাজ করে নেওয়া যাক। ধরা যাক ক বাবু তাঁর বাড়িতে একটি দেড় টনের এয়ারকন্ডিশনার বসালেন। যন্ত্রের দাম ধরা যাক চল্লিশ হাজার টাকা। বসাতে খরচ হল আরো পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ ক বাবু পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে যে যন্ত্র বসালেন সেটি তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট মানে প্রতিদিন তিনঘন্টা করে চালাতে লাগলেন। যদি ঠান্ডার পরিমাণ মাপা যেত টাকার অঙ্কে তাহলে দেখা যেত ক বাবু মাসে তিনহাজার টাকার ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করেছেন। এভাবে বছরে তিনি ছত্রিশ হাজার টাকার বাতাস উপভোগ করেছেন। এবার জুড়বে যন্ত্রের খারাপ হওয়া ও সারানোর খরচ, মসিক বিদ্যুতের বিল ইত্যাদি। সব জুড়ে দেখা যাবে ক বাবু বছরে ও যন্ত্রের জন্য খরচ করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। মানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে তিনি আরাম পেলেন টাকার মূল্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা এক বছরে। এবারে মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

একটা গাছের দাম কত হতে পারে? ছোট চারাগাছের দাম কত আর হবে এই চার পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ একশো টাকা! উঁহু সেকথা হচ্ছে না সে তো সবাই জানে। কথা হচ্ছে গাছ আমাদের কত টাকার উপকার দেয়? ধুর এটা কোন প্রশ্ন হল— ফুল ফল পাতা ছায়া এসব তো আমরা মুফতেই পাই আর গাছ কেটে বিক্রি করলে হ্যাঁ তা গাছ অনুযায়ী হাজার কয়েক টাকা তো পকেটে আসেই।

আরে ধূর মশাই ওসব কথাই হচ্ছে না। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে বট, অশথ্থ, পিপুল, নিম, জাম এইসব বড় বড় গাছ যারা পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বছর বাঁচে তারা টাকার মূল্যে আমাদের কতটা উপকার করে? ব্যাপারটা ঠিক খোলসা হচ্ছে না তো! না হবারই কথা কারণ আমরা তো মাগনাতে পেয়েই অভ্যস্ত এর আবার দামদস্তুর করা— এ কি হয় না কি!! হয় হয় একটা মাঝারি মাপের পঞ্চাশ টন ওজনের গাছ যদি পঞ্চাশ বছর বাঁচে তাহলে তার কাছ থেকে যেসব অত্যাবশ্যক উপকার আমরা পাই যেমন অক্সিজেনের উৎপাদন, প্রোটিন উৎপাদন, মাটির ক্ষয়রোধ, আবহাওয়ার তাপ ও আদ্রতার সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এমন সব নানা উপকার যদি টাকার মূল্যে বিচার করা যায় তাহলে তা কয়েক কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই বিষয়টা আমরা কেউ ভেবেই দেখিনি। দেখেছিলেন কলকাতারই একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানী তাও আজ নয় অন্তত তেতাল্লিশ বছর আগে। আর একটি পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন ২০১২ সালে। তাঁর এই অমূল্য কাজটি অস্ট্রেলিয়ার পার্থ মিউজিয়ামে রাখা আছে। কিভাবে তিনি অঙ্কটা কষেছিলেন এবার সেটা দেখা যাক।

অক্সিজেন উৎপাদন ঃ

আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, নিম বা অর্জুনের মত কুড়ি বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে

কান্ডের ওজন— ৩.৫ টন, শিকড়ের ওজন— ০.৫ টন, শাখাপ্রশাখা ও পাতার ওজন— ০.৫ টন অর্থাৎ মোট দাঁড়াল— ৪.৫ টন

মোট অক্সিজেন উৎপাদনের পরিমাণ ৪.৫ টন

অক্সিজেনের কে.জি প্রতি দাম যদি ৭০/- হয় তাহলে মোট অক্সিজেনের বাজারমূল্য দাঁড়ায় ৩,১৫০০০/-

পরের ৩০ বছরে নতুন শাখা,পাতা গজানোর পরিমাণ আনুমানিক ৩ টন তাই অক্সিজেন উৎপাদনের মূল্য ২,১০,০০০/-

তাহলে ৫০ বছরে গাছের মোট ওজন ৪.৫ + ৩ = ৭.৫ টন আর অক্সিজেন উৎপাদনের মোট মূল্য ৫, ২৫,০০০/-

এরমধ্যে গাছ থেকে ৫০ বছরে মোটামুটি ৫ টনের মত পাতা খসবে আর ৫০ বছর বাদে গাছের মূল শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অন্ততপক্ষে ৩০ ফুট বাই ৩০ ফুট মানে ৯০০ বর্গফুট মাটির কণা ধরে রাখে। মাটিতে ফুল, ফল, পাতা ঝরে জৈব সার তৈরিতে সাহায্য করে। গাছের এই মাটি ধারণ ক্ষমতার জন্যই বন্যা রোধ হয়। এখন এই কাজ যদি আমাদের মজুর লাগিয়ে করতে হয় তাহলে বছরে ব্যয় হয় ১০,০০০/- আর ৫০ বছরে এর মূল্য ৫,০০,০০০/-

জলের পুনরাবর্তন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ঃ

প্রস্বেদন ক্রিয়ার সাহায্যে জলের পুনরাবর্তন হয়ে প্রচুর বাষ্প পাতা থেকে বায়ুমন্ডলে যুক্ত হয়, তাপমাত্রা কমে। এই কাজ যদি আমাদের নিজেদের পাম্প বসিয়ে করতে হয় তাহলে

২টি ১/২ হর্স পাওয়ারের পাম্পের দাম— ৬০০০/-

পরিকাঠামো তৈরির খরচ— ১,৫০,০০০/-

মোট— ১,৫৬০০০/-

রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, বিদ্যুৎ, কর্মী ও অন্যান্য খরচ ৫০ বছরে–৭৭, ২৮,০০০/-

পাখী, কাঠবিড়ালি, পোকামাকড় ইত্যাদির আশ্রয়স্থল নির্মাণ ঃ

মাঝারি আকারের একটা গাছে গড়ে ১০ জোড়া পাখি, ৬ জোড়া কাঠবিড়ালি, অসংখ্য কীটপতঙ্গ, মৌমাছি, অপুষ্পক উদ্ভিদ আশ্রয় পেয়ে থাকে যারা নানাভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। এখন যদি গাছের বদলে আমাদের কৃত্রিম আশ্রয়স্থল নির্মাণ করতে হয় হিসাব করে দেখা গেছে তার খরচ দাঁড়াবে ৫০ বছরে ৬৪,৮৫০০০/-

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

গাছ যেভাবে পাতার সূক্ষ্ম রন্ধ্রের সাহায্যে নানা ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ যেমন সালফার, কার্বন, নাইট্রোজেনের নানা যৌগকে শোষণ করে বাতাসকে শুদ্ধ রাখে, বিপুল ধূলিকণা ভুষোকালি, ইত্যাদি পদার্থ পাতার গায়ে আটকে রেখে দূষণ অনেকটা রোধ করে আরও নানা উপায়ে সেই কাজ আমাদের আধুনিক মেশিন ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে করতে হত তাহলে হিসেব কষে দেখা গেছে ৫০ বছরে আমাদের খরচা হত ২০১,৬১,৫০০/-

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ গড়ে মোটামুটি ১৬ কিলোগ্রাম অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকেন এরমধ্যে যদি মাত্র ৩ কিলোগ্রামের দাম (২০%) ধরা যায় তাহলে দাম হয় ২১০ টাকা (৭০/- প্রতি কিলো অক্সিজেনের দাম ধরে) তাহলে ভারতের মোট জনসংখ্যা যদি কম করেও ১২০ কোটি ধরা হয় তাদের মোট খরচ হয় ১২০ × ৩ × ২১০ = ৭৫,৬০০ কোটি টাকা। গাছ না থাকলে এই টাকাটা আমাদের বার্ষিক বাজেটে ধরতেই হত কি না!!

যাক এবার আমরা যোগ করতে বসি আর গাছের উপকারের মোট মূল্যমানটা একবার স্বচক্ষে দেখে নিই।

অক্সিজেন উৎপাদন বাবদ— ৫,২৫,০০ + প্রোটিন উৎপাদন বাবদ ১,৫০,০০০ + ভূমিক্ষয় রোধ বাবদ ৫,০০,০০০/-

জলের পুনরাবর্তন বাবদ ৭৭,২৮,০০০/- পাখি, কাঠবিড়ালি ইত্যাদির বাসা বানানো বাবদ ৬৪,৮৫,০০০/- + বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বাবদ ২,০১, ২৫,০০০/-

মোট মূল্য = ৩,৫৫,১৩,০০০/-

তিন কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তের হাজার টাকা। মানে ৫০ বছরে একটা মাঝারি মাপের গাছ নিঃশব্দে আমাদের এই পরিমাণ টাকার উপকার করে হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে। ছায়া, ফল, ফুল পাতা যা আমরা অবাধে ভোগ করি এসব বাদ দিয়েও।

অক্সিজেন মাপা হয় কোন ইউনিট দিয়ে? সাধারণত লিটারে। কিন্তু পাউন্ড, কিলো বা টনেও মাপা যায়। যেমন ১ পাউন্ড মানে ০.৩৯৭৭ লিটার, ১ কিলো মানে ২.২০৫ পাউন্ড বা ০.৮৭৬৭ লিটার, ১ শর্ট টন মানে ২০০০ পাউন্ড বা ৭৯৪.৫ লিটার। একজন মানুষ সারা বছরে ৯.৫ টন বাতাস শ্বাসপ্রশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করলেও তার মাত্র ২৩% অক্সিজেন।

হ্যাঁ কান্ড বা মূলও অক্সিজেন উৎপাদনে সাহায্য করে। কান্ড তো সরাসরি বাতাস থেকেই Co_2 নিয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে সেটাকে চিনিতে পরিণত করে গাছের খাদ্য হিসেবে আর অক্সিজেনও তৈরি করে। সেইজন্যই গাছের কান্ডে রঙ করতে বারণ করা হয় যাতে বাষ্পমোচন ব্যাহত না হয়। গাছের মাটির ওপরের দিকে আর ঠিক নীচের স্তরের শিকড় (যেখানে কেঁচো জাতীয় পোকামাকড় থাকে) অক্সিজেন উৎপাদন করে যার নাম Soil Porosity.

গাছের দামের এই পরীক্ষাটা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চালানো হয়েছিল একটা মাঝারি মাপের পিপুল গাছের ওপর। আর অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল টন এককে।

প্রসঙ্গত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং এর হার নানা সময়ে কমাবাড়া করে। পাতা ঝরার সময় আর নতুন পাতা গজানোর সময় প্রক্রিয়ার হার সমান নয়। আবার ঝড় বা অন্য কোন কারণে ডালপালা ভেঙ্গে গেলে হার কমে যায়। পাতায় বেশী পরিমাণে ধুলো জমে থাকলেও হারের ফারাক হয়। কাজেই পরীক্ষা চালানোর সময় এগুলোও মাথায় রাখা হয়।

শেষপাতে আসা যাক। এই হিসেবটা প্রথম কষেছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রয়াত অধ্যাপক তারকমোহন দাস ১৯৭৯ সালে। তখনকার বাজারদর হিসেবে মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১৫, ৭০,০০০/- (পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকা)। এই ধরনের কাজ সারাবিশ্বে উনিই প্রথম করেছিলেন এবং ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক অধিবেশনে এটি পঠিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল কারণ এইভাবে গাছের উপকারের মূল্যমান যে করা যায় তা তিনিই প্রথম করে দেখিয়ে বুঝিয়েছিলেন একটা চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বড় গাছ কেটে ফেললে পরিবেশের কত ক্ষতিসাধন হয়। নতুন গাছ লাগালেও সেই ক্ষতি পূরণ হতে আরও কুড়ি পঁচিশ বছর লেগে যাবে তা বড় হতে।

২০১২ সালে ড. দাস তাঁর আগের করা হিসাবটি নতুন করে আবার কষেন এবং তার মূল্য দাঁড়ায় ওই ৩,৫৫,১৩,০০০/-

বলা নিষ্প্রয়োজন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি আমরা আবার নতুন করে হিসাব কষি তা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। একটা মোটামুটি রাফ হিসেবে দেখা যাচ্ছে অঙ্কটা প্রায় ছ'কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তাহলে আশাকরি বোঝা গেল গাছ আমাদের কি উপকার করে। এর মধ্যে অনেক উপকার ধরাই হয়নি যেমন গাছ থেকে প্রতিবছর আমরা কত জ্বালানী কাঠ পাই, ছাল কেটে কত ধরনের ওষুধ তৈরি হয় আর এই শীতকালে একটা খেজুর গাছ কত টাকার রস আমাদের মুফতে দেয়!

এখন আমরা কি করব? কেউ গাছ কাটতে এলে কি হিসেবটা তার সামনে ফেলে দিয়ে বলব আগে এই টাকাটা রাখ তারপর কাট। ফেল কড়ি মাখো তেল গাছ কি তোমার পর!

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sukanta60@gmail.com • M. 7001223049

ড. সু মে ধা ব্যা না র্জি

প্রতিবন্ধকতার কারণ ও প্রতিকারমূলক বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের বিশ্ব সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অক্ষমতা হল প্রতিবন্ধকতা, কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা এবং অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার জন্য একটি প্রচলিত শব্দ। এটি একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থার সাথে এবং সেই ব্যক্তির পরিবেশগত এবং ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিক কারণগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার নেতিবাচক দিকগুলি প্রদর্শন করে "(WHO 2001, p.213)। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, প্রতিবন্ধকতা যখন এমন পরিমাণে বিকশিত হয় তখন এটি অক্ষমতায় পরিণত হয়।

জেনেটিক মিউটেশন এবং তারতম্যের ফলে আণবিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়েছে যা বিভিন্ন প্রোটিনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। যার ফলে শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা এবং এমনকি গুরুতর পেশী বা রক্তের রোগ তৈরি হয় যা অক্ষমতা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতি অনেক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জেনেটিক রোগের আণবিক কারণের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা রিপোর্ট করে। প্রার্থীর জিন অনুসন্ধানের জন্য জেনেটিক কারণ সৃষ্টি করে এবং একটি ওয়েবভিত্তিক টুল তৈরি করেছে যা প্রার্থীর জিন সনাক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ফোকাস করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং প্রার্থীর কার্যকারণ SNPs সনাক্তকরণ ইন-সিলিকো পদ্ধতিকে সিলিকো পদ্ধতিতে নতুন জিন যার কার্যকারণ বৈচিত্র্য থাকতে পারে তা সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে।

বায়োইনফরমেটিক্স কী?

বায়োইনফরমেটিক্স হল একটি আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্র যা জৈবিক তথ্য বোঝার জন্য পদ্ধতি এবং সফট্‌ওয়্যার সরঞ্জামগুলি বিকাশ করে। বিজ্ঞানের একটি আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্র হিসাবে জৈব তথ্যবিজ্ঞান জৈব তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত এবং প্রকৌশলকে একত্রিত করে। বায়োইনফরমেটিক্স গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করে জৈবিক প্রশ্নের সিলিকো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। বায়োইনফরমেটিক্স প্রতিবন্ধকতার জেনেটিক কারণগুলির জন্য একটি আণবিক প্রভাব থাকতে পারে এমন মিউটেশনগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যের ইন সিলিকো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। জৈবিক তথ্য বোঝার জন্য এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য জিনগত রোগের কারণের জন্য জিন পরীক্ষা করার সুযোগ প্রদানের জন্য জিনোমিক পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাথে বায়োইনফরমেটিক্স প্রচেষ্টাগুলি বিকাশের পদ্ধতি এবং সফট্‌ওয়্যার সরঞ্জামগুলি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট রূপগুলি চিহ্নিত করার জন্য পরীক্ষামূলক পদ্ধতির পাশাপাশি গত এক দশকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলির আণবিক প্রভাবগুলি বোঝার জন্য তীব্র জৈব তথ্যবিজ্ঞান গবেষণা হয়েছে। উৎপন্ন তথ্যের মাত্রার জন্য তথ্য বিশ্লেষণের জন্য শক্তিশালী গণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যাই হোক এই তথ্যের ফলপ্রসূ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, জেনেটিক্স এবং আণবিক জীববিদ্যাসহ একাধিক শাখার মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

১. আণবিক বৈশিষ্ট্যসহ জেনেটিক বৈচিত্র তথ্য যা প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

২. মিউটেশনের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য যা প্রতিবন্ধকতাকে প্রভাবিত করে একটি আণবিক প্রভাব থাকতে পারে সেই বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতিগুলি বিকাশ করা।

৩. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সফল সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য এমন আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করা প্রয়োজন যা চিকিৎসা গবেষণার অগ্রগতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এমন প্রতিবন্ধকতা জিনগত কারণের পিছনে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগুলিকে একীভূত করতে আরও সক্ষম করবে।

চতুর্থত, এমন এক যুগে যেখানে 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' সঠিক পথ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন'-এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত জেনেটিক ডিসঅর্ডারের বিস্তৃত ইন-সিলিকো পদ্ধতিকে প্রতিবন্ধী সমস্যার অপরিহার্য কল্যাণের জন্য আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

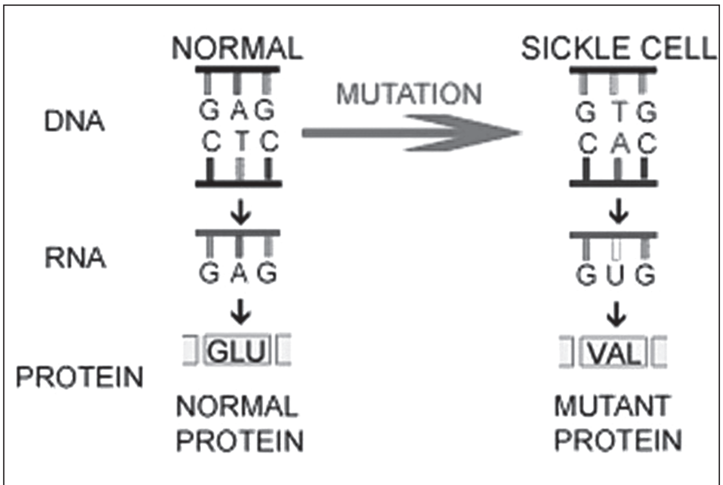

সিকেল সেল ডিজিজ

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হল অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনসহ একটি অটোসোম্যাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার যা ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন গুরুতর ক্লিনিক্যাল ফলাফলসহ দীর্ঘস্থায়ী হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার রোগের দিকে পরিচালিত করে। ক্রোমোজোম ১১-এ পাওয়া হিমোগ্লোবিন বিটা জিনে A থেকে T-এ বিন্দু পরিবর্তনের কারণে এ রোগটি হয়। এই রোগের একটি জিন আছে এমন ব্যক্তিরা চিকিৎসাগতভাবে সুস্থ, কিন্তু তাদের RBC মাইক্রোস্কোপের নিচে অস্বাভাবিক দেখায় (কাস্তে আকৃতির)। এই রোগের দুটি জিন (হোমোজাইগাস) যুক্ত ব্যক্তিরা তীব্র রক্তাল্পতায় ভোগেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির আগেই মারা যান।

চাক্ষুষ বৈকল্য

অ্যালবিনিজম আক্রান্ত ব্যক্তিরদের প্রায়শই দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় যে অনেকেই আইনত অন্ধ, যদিও তাদের মধ্যে খুব কমই দেখতে পায় না।

লেবারের জন্মগত অ্যামাউরোসিস জন্ম বা শৈশব থেকেই সম্পূর্ণ অন্ধত্ব বা গুরুতর দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। মানব জিনোমের ম্যাপিংয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলি কম দৃষ্টি বা অন্ধত্বের অন্যান্য জেনেটিক কারণ চিহ্নিত করেছে যেমন বারডেট-বিডল সিন্ড্রোম। গ্লুকোমা হল ছানির পরে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বৃহত্তম অন্ধজনিত ব্যাধি এবং ভারতে প্রায় 1.52 মিলিয়ন মানুষ গ্লুকোমার কারণে অন্ধ (মোট অন্ধ জনসংখ্যার 9%) এটি অপটিক নিউরোপ্যাথির একটি ভিন্নধর্মী গোষ্ঠী, যার একটি জটিল জেনেটিক ভিত্তি রয়েছে যা সতর্কতা ছাড়াই এবং প্রায়শই লক্ষণ ছাড়াই ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে।

বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি

বায়োইনফরমেটিক্স প্রতিবন্ধী সমস্যার জেনেটিক কারণগুলির জন্য একটি আণবিক প্রভাব থাকতে পারে এমন মিউটেশনগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ডেটার ইন-সিলিকো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে আণবিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে জেনেটিক বৈচিত্র্য ডেটা সম্পর্কিত যা প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত জেনেটিক ডিসঅর্ডারকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি প্রার্থী জিন সনাক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ফোকাস করে যেগুলির কার্যকারণ বৈচিত্র থাকতে পারে এবং প্রার্থীর কার্যকারণ SNPs সনাক্তকরণ ইন-সিলিকো পদ্ধতিতে নতুন জিন সনাক্তকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। ডেটা মাইনিং দ্বারা সম্পন্ন গণনামূলক বিশ্লেষণ ক্রম বিশ্লেষণ, ব্লাস্ট, মাইক্রোয়ারে বিশ্লেষণ, জিন অনুসন্ধান এবং বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ প্রদান করে। প্রধান পরিসংখ্যানগত কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে হাইপোথিসিস পরীক্ষা এবং অনুমান, পয়সন প্রক্রিয়া, মার্কভ মডেল এবং লুকোনো মার্কভ মডেল এবং একাধিক পরীক্ষার পদ্ধতি। হাইপারজিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশনের উপর ভিত্তি করে মোটিফ এবং পদ্ধতির পরিসংখ্যানগত তত্ত্বের আলোচনা ল্যাব পরীক্ষা দ্বারা নতুন হাইপোথিসিস পরীক্ষা করার সুযোগ দেয় যা প্রতিবন্ধী সমস্যা সম্পর্কিত মানব জেনেটিক্সের পাঠোদ্ধারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

বায়োইনফরমেটিক্স টুলস

ব্লাস্ট ফর বেসিক লোকাল অ্যালাইনমেন্ট সার্চ টুল হল প্রাথমিক জৈবিক তথ্যের তুলনা করার জন্য একটি অ্যালগরিদম, যেমন প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স বা ডিএনএ সিকোয়েন্সের নিউক্লিওটাইড। একটি ব্লাস্ট অনুসন্ধান একজন গবেষককে একটি লাইব্রেরি বা সিকোয়েন্সের ডাটাবেসের সাথে একটি ক্যোয়ারী সিকোয়েন্সের তুলনা করতে এবং লাইব্রেরি সিকোয়েন্সগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম করে যা একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপরে ক্যোয়ারী সিকোয়েন্সের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

একটি হিউরিস্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করে, ব্লাস্ট দুটি অনুক্রমের মধ্যে সংক্ষিপ্ত মিলগুলি সনাক্ত করে অনুরূপ ক্রম খুঁজে পায়। এই প্রথম ম্যাচের পরেই BLAST স্থানীয় প্রান্তিককরণ করতে শুরু করে। অনুক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করার সময় সাধারণ অক্ষরের সেট শব্দ হিসাবে পরিচিত আগ্রহের ক্রম এবং ডাটাবেস থেকে হিট ক্রম বা ক্রমগুলির মধ্যে সমস্ত সাধারণ তিন অক্ষরের শব্দগুলি সনাক্ত করে। এই ফলাফল তারপর একটি প্রান্তিককরণ নির্মাণ করতে ব্যবহার করা হবে।

BLAST অনুসন্ধানের জন্য একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্কোরিং ম্যাট্রিক্স হল BLOSUM62 যদিও সর্বোত্তম স্কোরিং ম্যাট্রিক্স ক্রম সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে। থ্রেশহোল্ড স্কোর T নির্ধারণ করে যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ প্রান্তিককরণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা। প্রান্তিককরণ উভয় দিকে প্রসারিত হয়, প্রতিটি এক্সটেনশন সারিবদ্ধকরণের স্কোরকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে প্রভাবিত করে। যদি এই স্কোরটি পূর্ব-নির্ধারিত T-র চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সারিবদ্ধকরণটি BLAST দ্বারা প্রদত্ত ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যাই হোক, যদি এই স্কোরটি এই পূর্ব-নির্ধারিত T-র চেয়ে কম হয়, তাহলে প্রান্তিককরণটি প্রসারিত হওয়া বন্ধ করে দেবে, দুর্বল প্রান্তিককরণের ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বাধা দেবে।

অনুসন্ধান

এইভাবে বায়োইনফরমেটিক্স রিপোর্টগুলি প্রতিবন্ধী সমস্যা সম্পর্কিত অনেক জেনেটিক রোগের আণবিক কারণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। রোগীদের এই জিনে একক নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম (SNP) প্যাটার্নের সনাক্তকরণ রোগের জটিল রূপগুলি দেখায় এবং পরে অ্যাসোসিয়েশন স্টাডিজ প্রতিবন্ধী সমস্যার জন্য চ্যালেঞ্জিং জেনেটিক কারণ বোঝার ক্ষেত্রে আলোকপাত করতে পারে। নতুন তিন সনাক্তকরণ এবং অন্তর্ভুক্তি প্রতিবন্ধী সমস্যা সম্পর্কিত জেনেটিক ব্যাধির কারণের জন্য এই জিনগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ প্রদান করে। ডেটা মাইনিং দ্বারা করা কম্পিউটেশনাল বিশ্লেষণ প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপনের প্রভাবগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ল্যাব পরীক্ষা দ্বারা নতুন অনুমান পরীক্ষা করার সুযোগ দেয় যা প্রতিবন্ধী সমস্যা সম্পর্কিত মানব জেনেটিক্সের পাঠোদ্ধারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

উপসংহার

এই সরঞ্জামগুলি মেন্ডেলিয়ান রোগের জন্য উপযুক্ত যা প্রভাবিত টিস্যুতে জিনের প্রকাশের ধরনে পার্থক্য দেখায়। এগুলি অন্যান্য জটিল রোগেও প্রার্থী জিনের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রধানত GO শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে এমন সরঞ্জামগুলির কিছু অসুবিধা রয়েছে যে টীকাটির (annotation) চলমান প্রক্রিয়ার কারণে GO টীকা সম্পূর্ণ হয় না এবং এতে ভালো বৈশিষ্ট্যযুক্ত বা অধ্যয়ন করা রোগগুলির প্রতি পক্ষপাতও রয়েছে। পূর্ববর্তী সরঞ্জাম যেমন SUSPECTS, POCUS এবং GZD প্রার্থী রোগের জিন সনাক্ত করতে বর্ণনামূলক কীওয়ার্ড অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

তথ্যসূত্র :

১. মুনি এস. বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি এবং একক নিউক্লিওটাইড পরিমারফিজম কার্যকরী বিশ্লেষণের জন্য সংস্থান। সংক্ষিপ্ত বায়োইনফর্ম। (পাবমেড)

২. Ng PC, Henikoff S. প্রোটিন ফাংশনে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপনের প্রভাবের পূর্বাভাস। আন্নু রেভ জিনোমিক্স হাম জেনেট। (পাবমেড)

৩. স্টুয়ার্ড RE, MacArthur MW, Laskowski RA, Thornton JM উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রোগের আণবিক ভিত্তি একটি কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ। ট্রেন্ডস জেনেট। (পাবমেড)

৪. কুপার DN, Stenson PD, Chuzhanova NA। হিউম্যান জিন মিউটেশন ডেটাবেস (HGMD) এবং মিউটেশনাল মেকানিজম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এর শোষণ। কার প্রোটোক বায়োইনফরমেটিক্স। (২০০৬) অধ্যায় ১ (ইউনিট ১.১৩) (পাবমেড)

৫. Hamosh A, scott AF, Amberger J, Valle D, McKusick VA। অনলাইন মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স ইন ম্যান (ওএমআইএম) হাম মুতাত।

লেখিকা সহশিক্ষিকা, পুটশুড়ি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান

email: sumedha_b@rediffmail.com • M. 9474138008

গৌতম সরকার

বাজি ও ডিজে : পরিবেশ আসলে আপনার হাতে

সম্প্রতি একাধিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সরকারি উদ্যোগে বাজি ব্যবসায়ীদের শংসাপত্র প্রদানের খবর। কার্যত সরকার বাজি শিল্পকে উৎসাহিত করে চলেছে। কিন্তু বাজি ও ডিজে বক্স আমাদের পরিবেশ ও মানব শরীরে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। বরং বহুবিধ ক্ষতির কারণ হয় তা। এটা ঠিকই, উৎসবের মরশুমে মানুষ উৎসবে মেতে উঠবেন, এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু উৎসব সকলের হবে, সবাই আনন্দে থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন এটাই হওয়া উচিত নীতি।

কিন্তু শব্দ ও বিষাক্ত ধোঁয়ার আক্রমণ মানুষ ও সমগ্র প্রাণীজগৎ তথা উদ্ভিদজগতকে করে তোলে বিষময়। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সাময়িক বিকৃত আনন্দের বলি হতে হয় আপামর শিশু বৃদ্ধ মহিলা পুরুষ যুবতী যুবককে। রেহাই পায় না গৃহপালিত বা পথকুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, কাকপক্ষীও। শুধুমাত্র কালি পুজোর রাতেই বাজির আলো ধোঁয়া ও আওয়াজে মারা যায় শতশত পাখি, আহত হয়, মারা যায় অন্যান্য পশুরাও। সঙ্গে দোসর ডিজে থাকলে মর্ত্যেই ভোগ করতে হয় নরক যন্ত্রণা।

আসুন একবার দেখা যাক কি কি ক্ষতি হয় ডিজে, জেবিএল বক্স ও বাজিতে—

- বাতাসে ভাসমান বিষের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফুসফুসের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করে। বাজির ধোঁয়া ফুসফুসে ঢুকে রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, ফলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।
- তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখের রেটিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- কোভিড আক্রান্ত বা পোস্ট কোভিড রুগীদের পক্ষেও আতসবাজি অতি বিপজ্জনক।
- অতিরিক্ত শব্দের ফলে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাতও হয়ে যেতে পারে।
- কানের পর্দা ফেটে চিরতরে বধির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শ্রবণযন্ত্রও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- হৃদরোগের শিকার হয়ে গুরুতর অসুস্থ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতেপারে। যেহেতু হার্ট শরীরের অন্য অঙ্গের তুলনায় দুর্বল তাই মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে হার্টের।
- মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।
- পশুপাখিরাও বিপন্ন হয়।
- কালিপুজো ও দিওয়ালীর পরে বহু পাখির মৃত্যু হয়।
- স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে মস্তিত্ব বিকল হতে পারে।
- যাঁরা আতসবাজি, শব্দবাজি বা ডিজের ব্যবহার করেন, উৎসব মিটলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি গভীর মানসিক অবসাদের শিকার হন। মানসিক অবসাদের কারণে তাঁরা মানসিক বিকৃতিরও শিকার হতে পারেন। কারণ তাঁরা বায়ু, আলো ও শব্দ তিন ধরনের দূষণের শিকার হন।
- বাজি তৈরিতে শিশু শ্রমিকদের বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়। বাজির মশলায় তাদের বিভিন্ন রোগ হয়। ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, পেটের গোলমালসহ একাধিক অসুখে আক্রান্ত হয়। কম মজুরিতে মহিলাদের ব্যবহার করা হয়। শ্রমিকদের কোনোরকম সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না।
- অতিরিক্ত ধোঁয়া, আলো ও শব্দের কারণে পশুপাখির জীবন বিপন্ন হয়। এমনকি পোষা প্রাণীও অস্বাভাবিক আচরণ করে। এমনকি জলের গভীরে থাকা মাছও বিপন্ন হয়।
- বাজি ব্যবহারের ফলে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের বর্জ্য জল ও মাটিকে দূষিত করে।

অথচ আতসবাজি, শব্দবাজি ও উচ্চ আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে একাধিক সরকারি নির্দেশ, আদালতের রায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা আছে। কিন্তু আইন রায় বা নির্দেশ তখনই কার্যকরী হয়, যখন অধিকাংশ মানুষ তা মেনে চলে, অন্যথায় প্রশাসনকে কঠোরভাবে উদ্যোগী হতে হয়।

অবশেষে ২০০০ সালে প্রণয়ন করা হয় শব্দদূষণ সংক্রান্ত নতুন আইন।

সেই আইনে বলা হয়,

- উৎসবের আনন্দকে বজায় রাখতে নিয়ম মেনে সাউন্ড লিমিটার সহ মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে।
- শব্দবর্জিত অঞ্চলে কোনো প্রকার শব্দদূষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও হাসপাতালের চারদিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা শব্দবর্জিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলে হর্ণ বাজানোও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
- নির্ধারিত সময়সীমা এবং প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না। রাত দশটার পর ও সকাল ছটার আগে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- উচ্চ বিস্ফোরক শব্দ যুক্ত বাজি বা পটকার (চকলেট বোমা, দোদোমা, কালিপটকা প্রভৃতি) উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনেরেটর সেট পর্ষদের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে ও শব্দ নিয়ন্ত্রক বেষ্টনী ব্যবহার করা আবশ্যিক।
- যানবাহনে এয়ার হর্ণ ব্যবহার, বিক্রয় এবং মজুত আইনত নিষিদ্ধ।
- পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলগুলিতে লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না।

বাজির ক্ষেত্রেও গতবছর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল শুধুমাত্র কালিপুজো ও দিওয়ালীতে সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কেবলমাত্র সবুজ বাজি ব্যবহার করা যাবে। কোনোরকম উচ্চ আওয়াজের বাজি ব্যবহার নিষিদ্ধ। পরে হাইকোর্টও রায় দিয়ে বলেছে, কলকাতার বাজিবাজারেও কেবলমাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি করা যাবে। যদিও সবুজ বাজির সংজ্ঞা নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। সবুজ বাজিতেও ৩০ শতাংশ মাত্র দূষণ কম হবে। ৭০ শতাংশ দূষণ বজায় থাকবে।

আমাদের গত বছরের অভিজ্ঞতায় কোনো সবুজ বাজি আমরা বাজারেও খুঁজে পাইনি।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সবুজ বাজির কারখানাকে সংশাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, যেহেতু ২০২১ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীও বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে যেমন, কালীপুজো ও দিওয়ালীতে সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা, ছটপুজোয় সকাল ৬টা থেকে ৮টা, ক্রিসমাসে রাত ১১.৫৫ থেকে ১২.৩৫, ইংরেজি নববর্ষে রাত ১১টা থেকে ১২.৩৫। মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার জন্য কেবল সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। এইসব দিন ও সময়ের বাইরে সব ধরনের বাজি নিষিদ্ধ। সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নগুলি উঠছে,

মোট কত সবুজ বাজি কারখানাকে শংসাপত্র দেওয়া হবে? তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত হবে? জেলা ও রাজ্যের বাইরে থেকে কত বাজি আমদানি করা হয়? হবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় কেবল সবুজ বাজি জ্বালালে কত বাজি জেলায় প্রয়োজন হতে পারে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাজি উৎপাদন হলে তা বাজেয়াপ্ত/আটকানোর পরিকাঠামো কি কিছু আছে? বাজি শিল্প যেহেতু মরশুমি শিল্প, শ্রমিকদের সারা বছর কাজ থাকা সম্ভব নয়। সবুজ বাজিতে ৩০ শতাংশ দূষণ কম হতে পারে। বাকি ৭০ শতাংশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কোনো পরিকল্পনা আছে কী?

শংসাপত্র দেওয়ার আগে প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া জরুরি বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় উত্তর আজও অধরা।

এমনকি দেখা যাচ্ছে সরকার বাজি ব্যবসায়ীদের নিয়ে যতটা ভাবিত, তার কণামাত্রও সাধারণ ভুক্তভোগী শিশু থেকে বৃদ্ধ, পশুপাখি তথা সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ে ভাবিত নয়। যা আমাদের আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত করছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে গ্রীন ট্রাইব্যুনাল সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করতে বললেও, তা যে হয়নি, তা একের পর এক বাজি কারখানার বিস্ফোরণই প্রমাণ করে।

লেখক সাধারণ সম্পাদক-বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
M. 9883325009

চিঠি

বিজ্ঞান অন্বেষক
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

"বিজ্ঞান অন্বেষক" পত্রিকার বর্ষ-উনিশ, সংখ্যা-৩, মে-জুন ২০২২ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ কথা **'আক্রান্ত হৃদয়'** কমলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "হৃদয়ের সাতকাহন" প্রবন্ধটি পড়লাম। বেশ তথ্যসমৃদ্ধ এবং মনোগ্রাহী রচনা। স্বাস্থ্য সমন্বিত এই লেখাটিতে লেখিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ডাক্তারি পরিভাষা সহযোগে সাধারণ মানুষের যাতে বোধগম্য হয় এমনভাবে হার্ট অ্যাটাক জনিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন। লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অলংকরণগুলিও ভালো। বিশেষ করে যখন হৃদয় জনিত অসুখের কবলে থাকা রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমার আপনার প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই এমন একজন অন্তত রোগী রয়েছেন ঠিক এইরকমই একটি সময় এমন প্রবন্ধ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই "বিজ্ঞান অন্বেষক" পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী কেও এমন একটি বিষয় যা নিয়ে অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, সেরকম একটি বিষয়কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য। প্রবন্ধটি যদি আরেকটু বড় হত হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচার জন্য কী কী করব, কী কী করব না, একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে কী কী করণীয়, ওষুধপত্র-হাসপাতাল-ডাক্তার-বদ্যি এই সমস্ত বিষয়ও যদি আরো একটু সম্বলিত করা যেত তাহলে প্রবন্ধটি আরো চিত্তাকর্ষক হত বলে আমার মনে হয়।

পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীকে বিনীতভাবে একটি অনুরোধ করি, পত্রিকার যেকোনো একটি সংখ্যা যেন শুধুমাত্র হার্টের অসুখ সম্বলিত হয় এবং সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশিত হোক যার মধ্যে, স্ট্রোক, ক্যান্সার, থাইরয়েড, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, পাইলস প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে লেখা থাকে। যা পড়ে আমরা সাধারণ পাঠকরা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে আমাদের বাড়িতে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যের যথাযথভাবে যত্ন করতে পারি।

নমস্কারান্তে,
অর্কজিৎ সেন
(বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার গ্রাহক)

ডা. সতীনাথ ভট্টাচার্য

পায়ে পায়ে ফিরুক স্রোত

"কবে যে কোথায় কি যে হলো ভুল / জীবন জুয়ায় হেরে গেলাম / বেহিসাবি মন রাখে নি হিসাব / কি দিয়েছি কি যে পেলাম।" একটু কান পাতলেই শোনা যায়, হতভাগিনী জলঙ্গি নদীর কান্নাভেজা গলায় এখন বাজছে এই গান। নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে, বিনিময়ে পেয়েছে অবহেলা আর লাঞ্ছনা। আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে জটিল রোগাক্রান্ত নদী। এক সময় এই নদী বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার অববাহিকায় গড়ে ওঠা সমস্ত জনপদকে। দু-হাত দিয়ে আগলেছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। বাঙালির পাতে তুলে দিয়েছে হরেকরকম মাছ। জলঙ্গির জলে সাঁতার কাটতো পরিযায়ী মাছ— ইলিশ, ভোলা, গলদা চিংড়ি। এই নদীর মিষ্টি জলে ডিম পাড়ত ইলিশ। জেলেদের ঘরে তখন লক্ষ্মী থাকতেন বাঁধা। এই নদীর জলেই চলতো চাষবাস। পণ্য পরিবহণের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম জলঙ্গির কোলে আশ্রয় পেয়েছে শুশুক, কুমীর। নদী অববাহিকায় বিভিন্ন জনপদে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র সব লোকসংস্কৃতি।

জলঙ্গির এইসব সুখের দিন আজ গিলে খেয়েছে আধুনিক সভ্যতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। নদীর উৎসমুখ বন্ধ। এখন মূলত বৃষ্টি, মাটির নীচের জল আর বর্ষায় সামান্য ভৈরবের জলে কোনরকমে বেঁচে আছে এই নদী। নাব্যতা তলানিতে। কচুরিপানা সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। নদীর বুকে মাটি ফেলে তৈরি হয়েছে বেআইনি রাস্তা। নদীপাড়ে মাটিমাফিয়াদের রাজত্ব। মাথা চাড়া দিচ্ছে অবৈধ নির্মাণ, ইঁটভাঁটা। নদীতে যত্রতত্র বাঁধাল। চলছে চটজালের যথেচ্ছ ব্যবহার। নদীগর্ভে একাধিক সেতু হয়েছে, কিন্তু নির্মাণের পর সেসব মাটি তুলে ফেলা হয়নি। নদীর বুকে চলছে অবৈধ চাষবাস। জলঙ্গির জলে মাছের আকাল। জেলেদের পকেট ফাঁকা। জলঙ্গিতে প্রতিবছর বর্ষায় সুতি নদীর দূষিত, কালো, বিষাক্ত জল এবং পাট পচা জল মাছের মৃত্যুবাণ সঙ্গে নিয়ে আসে। সমস্ত নিকাশি নালার জল অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি ফেলা হচ্ছে নদীর বুকে। প্লাস্টিকসহ সবরকম আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিনে রূপান্তরিত হয়েছে নদী। জলজ জীবের জীবন বিপন্ন। বাস্তুতন্ত্র নড়বড়ে।

দূষণে দূষণে জলঙ্গি এখন জর্জরিত, চলৎশক্তিরহিত। অঞ্জনা, ইছামতী, চূর্ণী, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদী ধুঁকছে। হারিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল-জলাশয়। আজ জলঙ্গি অববাহিকা বরাবর নয়টি ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলস্তর বিপদসীমার নীচে—এর মধ্যে সাতটি ব্লক ক্রিটিকাল আর দুটি সেমিক্রিটিকাল জোনে রয়েছে। উদ্বাহু নৃত্য করছে আর্সেনিক, নাইট্রেট। প্রায় দোরগোড়ায় চলে এসেছে নির্জলা দিন। আর কিছু দিন পরেই এক ফোঁটা জলের জন্য উঠবে হাহাকার। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। কিন্তু, সরকারের বড় বড় চেয়ারে বসে থাকা "আসি যাই মাইনে পাই" বাবুদের এসব নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে। পকেট ফুলে-ফেঁপে উঠলেই তাঁরা সহজেই চোখ বন্ধ করে ফেলেন। আচ্ছা, নদী না বাঁচলে, এইসব বাবুরা বাঁচবেন? তাঁদের উর্ধগামী ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কি জলের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে?

তবে, কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সব জায়গায় সব কালেই জন্মান যাঁরা চোখে ঠুলো আর কানে তুলো গুঁজে বসে থাকেন না। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ "টিনটার্ন অ্যাবে" কবিতায় ওয়ে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর কান্না শুনতে পেয়েছিলেন। শিল্প বিপ্লবের যে বিষাক্ত পরিণাম ওয়ে নদী বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই যেন বিষাদময়তায় শুনতে পেয়েছেন তিনি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই জলঙ্গির কান্না শুনতে পেয়েছেন নদীয়ার কয়েকজন তরুণ। নদীর দুর্দশা দেখে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন নি তাঁরা। কনকনে শীতে জনসাধারণ যখন উষ্ণতাকে জাপটে ধরে নিশ্চিন্তে সুখনিদ্রায়, তখন নদী ও জলাশয় রক্ষা করতে আনুমানিক ১৩৮ কিলোমিটার পথ হাঁটলেন একঝাঁক ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো তরুণ— অনুপ হালদার, রজত দাস, শঙ্খশুভ চক্রবর্তী, তন্ময় সরকার, জয়দেব দে, বিশ্বজিৎ মজুমদার ও জিসান হোসেন। পথিমধ্যে জুটে গেছে বহু শুভাকাঙ্ক্ষী—কেউ চিকিৎসক, কেউ শিক্ষক, কেউবা আইনজীবী কিংবা চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী। পায়ে পা মিলিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। যোগ দিয়েছে স্কুলের কচিকাঁচারা। সকলের বিশ্বাস, এই চলার ছন্দে একদিন ঠিকই ফিরে আসবে নদীর ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ।

নতুন বছরে গত ২ জানুয়ারি এই পদযাত্রা শুরু হয় করিমপুর ২ ব্লকের চর মোক্তারপুরে ভেলানগর ঘাট (জলঙ্গি ও ভৈরবের সঙ্গমস্থল) থেকে। সপ্তাহব্যাপী এই পদযাত্রা থেমেছে ৮ জানুয়ারি স্বরূপগঞ্জে যেখানে জলঙ্গি মিশেছে ভাগীরথী-হুগলীর সাথে। হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে লিফলেট বিলি, পথসভা। পাশাপাশি চলেছে স্কুলে স্কুলে পড়ুয়াদের সচেতন করার কর্মসূচি।

২ জানুয়ারি চর মোক্তারপুরে পদযাত্রার শুভারম্ভ হয়। শেষ হয় নাজিরপুরে। এদিন আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার পথ হাঁটা হয়েছে। চর মোক্তারপুর, হাগনাগাড়ি, অমিয় নারায়ণপুর আর নাজিরপুরে হয়েছে পথসভা। এছাড়া ফাজিলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিয়ারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সচেতন করার কর্মসূচি চলেছে। পরদিন নাজিরপুর থেকে শুরু হয়ে আনুমানিক ২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পলাশীপাড়ায় থামে পদযাত্রা। রাধানগর ও পলাশীপাড়ায় পথসভা আর আশুতোষ দত্ত মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাটিকাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গিয়ে নদী ও জলাশয়ের দুর্দশা বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। ৪ জানুয়ারি পলাশীপাড়া থেকে চাঁদের ঘাট পর্যন্ত আনুমানিক ২৩ কিলোমিটার হাঁটা হয়েছে। এদিন তেহট্ট বাজার ও চাঁদের ঘাট পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পথসভা হয়। নিমতলা হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা দিয়েছেন। এই স্কুলে নদী ও জলাশয় রক্ষার্থে জোরালো বক্তব্য

রাখা হয়েছে। এদিন চাঁদের ঘাটে স্থানীয় মানুষজনের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

৫ জানুয়ারি চাঁদেরঘাট থেকে পদযাত্রীরা আনুমানিক ২২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছান সুখসাগর ঘাটে। চাঁদেরঘাট থেকে প্রথমে আসা হয় বড় আন্দুলিয়ায়। সেখানে হালদারপাড়ায় একটি পথসভা হয়। বড় আন্দুলিয়া বয়েজ হাইস্কুল এবং বড় আন্দুলিয়া গার্লস হাইস্কুলে পড়ুয়াদের কাছে নদী ও জলাশয় বিষয়ে সচেতনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন পদযাত্রীরা। এরপর জলঙ্গিপাড়ে ন্যাশনাল ক্লাবের ঘরে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আবার শুরু হাঁটা। দুপাশে হলুদ সরষে খেতকে সাক্ষী রেখে এগিয়ে যাওয়া। পথ এসে থামে হাটরা ঘাটে। ওপারে তেঘড়ী। হাটরা থেকে তেঘড়ী পর্যন্ত জলঙ্গির ঘাটটিই হলো সুবিখ্যাত "ঈশ্বরী পাটনীর ঘাট"। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে উল্লেখ আছে যে, বড়গাছি গ্রামের হরি হোড়ের বাড়ি ত্যাগ করে দেবী অন্নপূর্ণা নদীর পূর্ব পাড়ে আন্দুলিয়া গ্রামে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতে পদার্পণ করেন। এই ঘাটেই ঈশ্বরী পাটনী তাঁকে নৌকায় করে খেয়া পার করে দেন। এখনও ঈশ্বরীর বংশধরেরাই এই ঘাটে খেয়া পারাপারের কাজ করেন। হাটরা ঘাট থেকে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে পদযাত্রী দল উপস্থিত হয় তেঘড়ী ঘাটে। সেখানে দেখা পাওয়া যায় ঈশ্বরীর বংশধর মাঝবয়সী আনন্দ মাঝি (পাত্র)-এর। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাঁর। জানা যায়, আনন্দের ছোটবেলাতেও এই নদী ছিল ভরাযৌবনা। পাওয়া যেতো হরেকরকম মাছ। জেলে, মাঝিদের পকেট থাকতো গরম। কিন্তু, সেদিন হয়েছে বাসি। দেবী অন্নপূর্ণার স্পর্শ পাওয়া নদী এখন গঙ্গাপ্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে। জেলে, মাঝিরা আজ আর "দুধেভাতে" নেই। দেবী অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ বাস্তবের কঠিন পাথরে ধাক্কা খাচ্ছে। এবার তেঘড়ী ঘাট থেকে শুরু হলো হাঁটা। খানিক এগিয়ে ডানদিকে দেখা গেলো অন্নপূর্ণা ও নর্মদা মায়ের এক অপরূপ মন্দির। মন্দির পেরিয়ে দুপাশে খেতের সবুজ ছোঁয়া মেখে পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চলা। পড়ন্ত বিকেলে পথ শেষ হলো সুখসাগর ফেরীঘাটে। সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক ঐতিহাসিক বটগাছ। অতীতে বহু মনীষী খেয়া পারাপারকালে এই গাছের সুশীতল ছায়ায় খানিক জিরিয়ে নিয়েছেন। এই গাছতলাতেই পথসভা হয়ে এদিনের পদযাত্রার সমাপ্তি হয়েছে। নদীর জলে ভেজা মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মোড়া স্নিগ্ধতায় ভরপুর এই গ্রাম। কবি রবিউল আলম মন্ডলের ভাষায়— "জলঙ্গীর তীরে, ভালোবাসার নীড়ে, / যে ছোট্ট গ্রামখানি উঠেছে গড়ে, / সে তো সুখের এক মহাসাগর, / তাই গ্রামের নামও যে 'সুখসাগর'।"

পরদিন ৬ জানুয়ারি পদযাত্রী দল সুখসাগর থেকে চাপড়াতে পৌঁছায়। মোট ২২ কিলোমিটার পথ হাঁটা হয়। চাপড়া বাজারে পথসভা হয়েছে। বাঙ্গালঝি রামকৃষ্ণ আশ্রম হাইস্কুল, তিলোত্তমা ড্যান্স স্কুল এবং তন্ময় যোগা সেন্টারে নদী ও জলাশয় বাঁচাতে সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ৭ জানুয়ারি চাপড়া থেকে শুরু হয়ে মোট ১৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কৃষ্ণনগরে পদযাত্রা থেমেছে। এদিন সাতমাইল, দৈয়ের বাজার, জাভা, ঘূর্ণি হালদারপাড়া মোড় ও কৃষ্ণনগর হেড পোস্ট অফিস মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হেড পোস্ট অফিস মোড়ে বিশাল পথসভায় অন্যতম বক্তা, "অন্যমন" পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট সুফিয়া কামাল গবেষক ও অধ্যাপক নিবেদিতা দত্ত চক্রবর্তীর কথায়, নদীমাতৃক দেশে এখন আমাদের নদীঋণ পরিশোধ করার সময় এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, দুশো বছর পূর্ণ করা বাংলার মধুকবিও কপোতাক্ষ নদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। শেষদিন ৮ জানুয়ারি ঘন কুয়াশামাখা সকালে কৃষ্ণনগর হেড পোস্ট অফিস মোড় থেকে শুরু হয় হাঁটা। এদিন মোট ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হয়। পথিমধ্যে আমঘাটা-শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, স্বরূপগঞ্জে পানশিলা উচ্চবালিকা বিদ্যালয় ও ভাগীরথী বিদ্যাপীঠে ছাত্র-ছাত্রীদের কানে নদী ও জলাশয়কে পরম যতনে আগলে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা পৌঁছে দেন "সেভ জলঙ্গি নদী সমাজ"-এর সভাপতি, প্রখ্যাত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডা: যতন রায়চৌধুরী। পানশিলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও সহ-শিক্ষিকাগণ পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা দেন। আমঘাটা-শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে এদিন একটি পথসভা হয়। স্বরূপগঞ্জে জলঙ্গি ও ভাগীরথী-হুগলীর সঙ্গমস্থলের কাছে শেষ হলো এই ঐতিহাসিক পদযাত্রা। পদযাত্রীরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন নদীয়ার জীবনরেখা মাতৃস্বরূপা জলঙ্গিকে।

"দ্য গ্রীন ওয়াক", "বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা" এবং "সেভ জলঙ্গি নদী সমাজ"-এর উদ্যোগে এই পদযাত্রা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন। ছুটে এসেছে নওদা থেকে ডমরু ড্যান্স একাডেমি, ফুলিয়া থেকে "অন্যমন" পত্রিকা গোষ্ঠী, কৃষ্ণনগর থেকে "শস্য" পত্রিকা গোষ্ঠী। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলকষ্ট থেকে বাঁচাতে মরিয়া পদযাত্রীদের কর্মসূচি যেন এখানেই ডানা মেললো। তাঁরা যে শুধু চলতেই জানেন, থামতে শেখেননি। ফোস্কা পরা পায়েই এগিয়ে যান তাঁরা। কেননা, পথই যে খুঁজে দেয় পথের দিশা। তপ্ত অঙ্গার ভূমি বা শূন্য গর্ভ খাদের পথে পা না বাড়িয়ে তাঁরা চলতে থাকেন সমুখপানে। অসুস্থ নদীর ওষুধের সন্ধানে। জীবন্ত হয়ে লাফাতে থাকে স্বপ্ন-শবগুলো।

লেখক পেশায় চিকিৎসক ও পরিবেশকর্মী

email: satinath208@gmail.com • M. 9474479255

প্রবীর বসু

মোটরগাড়ি বনাম সাইকেল

দিন দিন সাইকেল আরোহীর সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের নির্ঝঞ্ঝাট পরিবহনের ক্ষেত্রে সাইকেল পৃথিবী ব্যাপী আস্থা অর্জন করছে। তৃতীয় বিশ্বে বিশেষত ভারত ও চীনে ৮০০ মিলিয়ন সাইকেল নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সাইকেল ক্রমাগত মোটরগাড়িকে পরাস্ত করে বিশ্ববাজারে তার পরাক্রম বাড়িয়ে চলেছে। বিগত বছরে যেখানে মোটরগাড়ি রাস্তায় বেরিয়েছে ৩৩ মিলিয়ন, সেখানে সাইকেলের সংখ্যা ১০৫ মিলিয়ন। শুধুমাত্র এশিয়াতেই নয় ছোটোখাটো দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষেত্রে সাইকেল পছন্দ দেশ যেমন, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি এবং জাপানে প্রচুর পরিমাণে সাইকেল ব্যবহৃত হচ্ছে। ওইসব দেশে সরকারিভাবে যানজট বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাইকেল ব্যবহারকে উন্নত ও সুবিধাজনক বিকল্প হিসেবে ভাবছেন মোটাগরড়ির তুলনায়। এমনকি কলম্বিয়াতে প্রতি রবিবার সকালে ৩৭ মাইল মোটর পরিবহনের রাস্তাকে বন্ধ রাখা হচ্ছে এবং অর্ধ লক্ষাধিক শহরবাসী ওই রাস্তায় সাইকেলে পরিভ্রমণ করছেন। ধোঁয়া, বায়ু দূষণে আক্রান্ত পৃথিবী ব্যাপী মানুষ চিন্তিত। বর্তমানে সাওপাওলো থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ চোখ, নাক, গলার ক্ষেত্রে নানারকম যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিতে ভুগছেন, সঙ্গে রয়েছে মাথা ধরা, হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্ট। এই সবই রাস্তা জুড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় দূষণের ফলে। বিশেষত কুয়াশা এবং ধোয়া এছাড়াও নিয়মিত মোটরগাড়ি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা মানুষকে যানবাহন থেকে সরিয়ে মানুষের পায়ের ওপর ভর করা সাইকেলকেই প্রকৃত অর্থে সুস্থ এবং সুসংহত পরিবহন হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে।

সত্যি বলতে কী সাইকেলের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ও নেই দেশের নীতি নির্ধারকদের। জ্বালানি তেলের দখলদারি নিয়ে কয়েকটা যুদ্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীতে। মাটির তলার সেই তেলের ভাণ্ডার আর অন্য সমস্ত ফসিল ফুয়েল ফুরিয়ে যাবে আগামী আর কয়েক দশকের মধ্যে। সাইকেল-এর মতো সাস্টেনেবল পরিবহন ব্যবস্থাকে এই মুহূর্ত থেকেই আয়ত্ব করা ছাড়া উপায় নেই আমাদের। কোপেনহেগেন, ব্রাসেলস বা প্যারিস সহ ইউরোপের বেশ কিছু শহরে বহুদিন আগে থেকেই নৈতিকভাবে সাইকেলকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখেছে তাদের পরিবহন ব্যবস্থায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী নেদারল্যান্ডের মানুষ গাড়ি বাদ দিয়ে যে পরিমাণ সাইকেল চালান ও তার ফলে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড কম হয় তা কোনো একটি বছরে সাড়ে পাঁচ কোটি বৃক্ষরোপণের সমতুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮ সালে ৩৮টি প্রধান রাস্তায় সাইকেল চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এতে প্রবল অসুবিধার মধ্যে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। তবে পরবর্তীকালে ছোটো ছোটো দূরত্বে অহেতুক প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার না করে পরিকাঠামো তৈরি করে সাইকেল আরোহীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সাইকেলকে নিরাপদ বাহন প্রজেক্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ছোট দূরত্বে মোটরগাড়ির পরিবর্তে যদি সাইকেল ব্যবহৃত হয় তবে প্রতি বছর সাশ্রয় হবে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। এটা ভারতের মোট জিডিপির ১.৬ শতাংশের সমান।

তাছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং বয়সের কথা বিবেচনা করে তিনরকম অভ্যাস বা অনুশীলনের কথা স্বাস্থ্য বিষয়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন, ১। দৌড়ানো ২। সাঁতার কাটা এবং ৩। সাইকেল চালানো। তবে স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করে দৌড়কে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাঁতার কাটা, হাঁটা এবং সাইকেল চালানোকে চালিয়ে যেতে বলেছেন। সাইকেলে অতি সহজেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা যায়। তাছাড়া বর্তমান বাজারে পেট্রল, ডিজেলের যা বাজার দর তাতে সাইকেল আরোহীদের নিজের ওপর ভরসা রাখা সাইকেলকেই বেছে নেওয়া উচিত।

অনেকে বলে, বয়স্কদের সাইকেল চালানো উচিত নয়। তবে এই ধারণা সঠিক নয়। এখন রাস্তাঘাটে ৬৫-৭০ বছরের মানুষকে নিশ্চিন্তে, উদ্বেগহীনভাবে সাইকেল চালাতে লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রয়োজনে বয়স্ক মানুষেরা উন্নত প্রযুক্তির সাইকেল ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রম থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। সাইকেল চালানো সাধারণ বয়সের পাশাপাশি বয়স্ক মানুষকেও মানসিক শান্তি ও উত্তেজনা বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে। আর তাছাড়া বর্তমানে আমাদের কলকাতাতেও মোটাগাড়ির পাশাপাশি সাইকেলের জন্য পৃথক লেনের ব্যাপারে দাবি করা হচ্ছে। নিউটাউনে কিছু সাইকেল লেনের কাজ হলেও মূল কলকাতায় এখনও একটিও সাইকেল লেন নেই।

আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে যত কম মাত্রায় মোটরগাড়ি নিত্য পথে যাতায়াত করে, মোটরগাড়িতে যে ধোঁয়া বা বাষ্প নিষ্কাশিত হয় তা বড় মাপের বাসের ক্ষেত্রেও হয় না। মোটরগাড়ির ধোঁয়া যা খুব বেশি দৃশ্যমান নয় কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত এই ধোঁয়া মানব শরীরের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিষময় প্রভাব ফেলছে।

তাই প্রবীণ পরিবেশবিদ ও চিন্তাবিদ লেস্টার আর ব্রাউন তাঁর বইতে শহরে সাইকেলকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনাকে সভ্যতার এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

লেখক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

অ সি ত পা ল

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট

আমাদের শরীরের কোষের মধ্যে অনেক জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া 37ºC উষ্ণতার আশেপাশে সর্বদাই ঘটে চলেছে। এই বিক্রিয়াগুলোতে অনেক বিক্রিয়ক বিক্রিয়াশৃঙ্খলে (Chain) পরপর অংশগ্রহণ করে, কখনও কখনও চক্রাকারে বদ্ধশৃঙ্খলে বিক্রিয়া ঘটে। আমরা জানি জৈবিক পদার্থ বেশি উষ্ণতায় নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য উষ্ণতা বেশি হলে বা কোনো বিক্রিয়ক বেশি বেশি মুক্তমূলক বা আধানহীনমূলক দ্বারা আক্রান্ত হলে কী জৈবরাসায়নিক পরিস্থিতি হবে তা বলা কঠিন। এই খারাপ অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে এদের বিপরীতধর্মী বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের প্রয়োজন হয়।

মুক্তমূলক হল পরমাণুর বিশেষ অবস্থা বা অণুর বিশেষ অবস্থা যেখানে যোজ্যতাকক্ষে বা বাইরের কক্ষে বিজোড়সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। এগুলো হতে পারে OH, Cl, O_2^{-1}, ROO^{-1}, HOO^{-1}, NO^{-1} ইত্যাদি বা আধানহীন অক্সিজেন পরমাণু (O), হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) । কোষের পেরাক্সিজোম (Peroxisome) নামক কোষ অঙ্গাণুতে (Microbodies) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ধ্বংস হতে পারে, বা সৃষ্টি হতে পারে দুরকম উৎসেচক দ্বারা। শরীরের ক্ষতস্থানে এই পারঅক্সাইডের প্রয়োজন হয়। সেজন্য বহুদিন ধরে পারঅক্সাইডের উপস্থিতি বা ক্ষত না সারলে চিন্তার কারণ ক্যানসার হওয়ার ব্যাপারে। এই বিক্রিয়কগুলো বিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতি (reactive oxygen species–ROS) ও বিক্রিয়াশীল নাইট্রোজেন প্রজাতি (NOS) এই দুইদলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুক্তমূলকগুলোর বৈশিষ্ট্য হল ১. এরা খুব বিক্রিয়াশীল এবং বিক্রিয়াগুলো তাপমোচী হয়, ২. এদের অর্ধেক হওয়ার (half life) হওয়ার সময় খুব কম, ৩. জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার শৃঙ্খল বা চক্রের মাঝখানে অংশগ্রহণ করে শৃঙ্খল বা চক্র নষ্ট করে।

ROS ও NOS সম্বন্ধে জ্ঞান তৈরি হয়েছে কোষের মধ্যে জৈবিক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় অধিকাংশ ROS এর উৎস যারা স্বাভাবিকভাবে কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রতিকূল অবস্থায় বেশি উৎপন্ন হয়। ROS প্রায় সমস্ত জৈবিক অণুকে (প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি) নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। আবার কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে প্রোটিন যুক্ত হলে মুক্তমূলক দ্বারা আক্রান্ত হয়। যেটা হয় ডাইবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে বা প্রোটিনপ্রধান আহার গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে যেখানে প্রোটিন থেকে শক্তি উৎপন্ন করার প্রয়োজন হয়।

এই মুক্তমূলকগুলো হল অক্সিডেন্ট বা জারণধর্মী যাদের প্রশমন করতে বিজারণধর্মী অণু বিশেষ বা পরমাণু-বিশেষের প্রয়োজন হয়। এদের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বলে। আগে থেকে বলা যায় না শরীরে কোথায় প্রয়োজন হবে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের। স্বাভাবিকভাবে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রয়োজন মেটে মেটাবলিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দিয়ে। এই ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো হল ইউরিক অ্যাসিড, অ্যালবুমিন, বিলিরুবিন, ট্রান্সফারিন ইত্যাদি। শরীরে যেগুলো উৎপন্ন হয় না সেরকম অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলোর মিশ্রণ ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে—যেটা ডাক্তাররা কোনো রোগ সেরে গেলে বা নিয়ন্ত্রণে আসলে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই ক্যাপসুলের দাম অনেক বেশি। আর নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। সেজন্য মরশুমি ফল বা খাদ্যদ্রব্যে দৈনিক খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বেশি খেতে নেই কারণ বেশি মুক্তমূলক তৈরি হয় না আমাদের সুস্থ শরীরে। সাধারণভাবে বলা যায় ROS DNA-এর পুনর্নির্মাণ (repair) হতে বাধা দেয়, ফলে বিশেষ প্রোটিন তৈরি হয় না, সেজন্য ক্যানসার হতে পারে। মুক্তমূলক অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস নষ্ট করে ডায়াবেটিস করে, LDL তৈরি করে যা অ্যাথেরোস্কেরোসিস তৈরি করে যা ধমনীতে রক্তপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের জন্য ছানি তৈরি করে।

অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বিভিন্ন রকমের হয় বিভিন্ন রকম মূলকের জন্য। যেমন ভিটামিন A, ভিটামিন C, ভিটামিন E, সেলোনিয়াম, জিঙ্ক এবং লাইকোপিক অ্যাসিড, গ্লুটাথিয়ন ইত্যাদি।

ভিটামিন E—মুক্তমূলক তৈরির বিক্রিয়ায় শৃঙ্খল ভাঙে ভিটামিন E; এই ভিটামিন কোষপর্দার অক্সিডেটিভ ধ্বংসকরণ রোধ করে। এই ভিটামিন (টোকোফেরল) বেশি থাকে অঙ্কুরিত গমে, ডিমের কুসুমে, নারকেলে।

ভিটামিন C—অনেক স্বাভাবিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

ভিটামিন A—ফ্যাটদ্রাব্য যৌগ যা অনেক প্রকারের হয়। যেমন বিটাক্যারোটিন, লাইকোপিন, লুটিন ইত্যাদি। বিটাক্যারোটিন ভিটামিন C ও ভিটামিন E-র সঙ্গে একত্রে কাজ করে। এই ভিটামিন ত্বকের রক্তনালীর, পৌষ্টিকনালীর এপিথেলিয়াল স্তরকে রক্ষা করে অর্থাৎ কোষকে রক্ষা করে। কোষরক্ষা পেলে কোষের অস্বাভাবিক মাইটোসিস বিভাজন হয়ে কোষসংখ্যা দ্বিগুণিত হতে পারে না, অন্য কথায় টিউমার হতে বাধা দেয়। লাইকোপিন মুখের স্বাস্থ্য, হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিরোধ করে, ফুসফুস, প্রস্টেট ক্যানসার প্রতিরোধ করে। লাইকোপিন আছে লাল বা বেগুনী রঙের ফল ও সবজিতে। যেমন— টম্যাটো, পেঁপে, লাল পেয়ারা, তরমুজ,

বিটাক্যারোটিন বেশি আছে গাজর, কুমড়ো, আম ইত্যাদিতে।

মেলেনিয়াম ভিটামিন E-র সঙ্গে একত্রে কাজ করে। এই মৌলের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বা বিজারণ ধর্মের ক্ষমতা অক্সিজেনের থেকে বেশি থাকে। কারণ পর্যায়সারণীর কোনো অধাতব গ্রুপে (এখানে VI) উপর থেকে নীচে নামলে বিজারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই VI নম্বর গ্রুপে O, S, Se পরপর নীচের দিকে অবস্থিত। সেলোনিয়াম সূর্যমুখী বীজে, সামুদ্রিক খাদ্যবস্তুতে আছে। যেখানের মাটিতে এই মৌলের যৌগ বেশি থাকে সেখানের ফসল বা ফলে সেলেনিয়াম পাওয়া যায়। সেলেনিয়ামযুক্ত দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। তাহলে প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা হবে ২২টা। সেলেনিয়ামযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড লিভার ও থাইরয়েডে শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। অর্থাৎ প্রাণীদেহের লিভার, থাইরয়েডে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জিঙ্ক—জিঙ্ক একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা স্তন, প্রস্টেটকে ভালো রাখে। এটা পাওয়া যায় খোলসযুক্ত প্রাণীতে যেমন—শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদিতে। জিঙ্ক পিতল কাঁসা বাসন তৈরিতে লাগে। সেজন্য কেউ কেউ এইরকম থালায় খাবার খেয়ে থাকেন।

আলফা লাইকোপিক অ্যাসিড এটাকে সার্বজনীন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলা হয়। কারণ এটা ফ্যাট ও জলে দ্রবীভূত হয়। এটা রেডমিটে থাকলেও রেডমিট খেতে না বলেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা, কারণ রেডমিট খেলে কোলনের পরিবেশ ভালো থাকে না। কোলন ক্যানসার হতে পারে। হার্টের রোগে, ডায়াবেটিক রোগে প্রয়োজন হয়, কর্ণিয়া রক্ষা করে এই যৌগ। এটা থাকে লিভার, ইস্ট, ব্রকোলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটোয়।

এছাড়া কোকো, কফি, কালো আঙুর, আঙুর দানা, গ্রীন টী, কাঁচা হলুদ, কাঁচা পেয়াজ, জাম, বেদানা, আখরোট, বেরী, টেপারী, ইত্যাদিতে বিভিন্নরকমের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে।

এককথায় দূষণ বা স্ট্রেস বেশি হলে বিভিন্নরকমের অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করা দরকার। যেমন— ADEKC ভিটামিনগুলো, ওমেগা-3 সহ ভিটামিন E, সেলেনিয়াম, Zn-এর সমন্বয় ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র :

১. ইন্টারনেট। ২. Biochemistry–Dr. U. Satyanarayana.

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: asitpal113@gmail.com • M. 9433645435

তৃতীয় প্রচ্ছদের শেষাংশ

বাবুই পাখিরা বাসভূমি হারাচ্ছে

বেশিরভাগ সময়ে এরা এক সাথে দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শস্য ক্ষেতের মধ্যে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এরা যখন বাসা বাধেঁ তখন বাসা বানাবার জন্য যে সরঞ্জামটি খোঁজে সেটি হলো নলখাগরার ও হোগলার বন, কিন্তু এই দুটি জিনিসই আমাদের পরিবেশ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এরা সবসময়ে মুখে চিঁ চিঁ করে আওয়াজ করতে থাকে। এই আওয়াজটি পুরুষ বাবুই পাখিরাই একসাথে সব থেকে বেশি করে থাকে। এরা দলবদ্ধ ভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে এক জায়গা থেকে উড়ে গিয়ে আবার আর এক জায়গাতে বসে।

এরা যে জায়গাতে বাসা বানায় সেখানে এক সাথে ২০-৩০টা বাসা এক সাথে দেখা যায়। এদের বাসা বানানোর জায়গাটা নির্ভর করে জল, খাদ্য ও বাসা বানানোর উপযোগী সরঞ্জাম যেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তার উপর। বাসা বানানোর সময়ে একটা বিষয় খুব চোখে পড়েছে সেটা হলো পুরুষ বাবুই পাখির তুলনায় স্ত্রী বাবুই পাখির সংখ্যা কিন্তু অনেক কম থাকে। একাধিক পুরুষ পাখি একই স্ত্রী বাবুই পাখির জন্য বাসা বানায়। বাসা বানানো যখনই শেষ হয়ে যায় তখনই এরা প্রজননের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্ষার মুখেই বাবুই পাখির প্রজনন হয়। এদের প্রজননের সময় খুব একটি মজার ঘটনা ঘটে ও আমাদের এদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তোলে। বাসা বানানো শেষ হয়ে গেলে পুরুষ বাবুই পাখি এমন ভাবে তার পাখাটি মেলে ধরে যে তাতে স্ত্রী পাখিটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে অর্থাৎ স্ত্রী পাখিটি পুরুষ পাখির প্রেমে পড়ে যায়। যদি স্ত্রী বাবুই পাখির বাসাটি পছন্দ হয় তবেই স্ত্রী বাবুই পাখিটা বাসায় প্রবেশ করে। বাসায় স্ত্রী বাবুই পাখি ২-৪টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী বাবুই পাখির উপর পুরুষ বাবুই পাখির আর কোনো আশক্তি থাকে না। তখন আবার পুরুষ বাবুই পাখিটা নতুন করে তার নতুন জীবন সঙ্গীর জন্য বাসা বুনতে থাকে। এই ধারা অবিরাম যেন এই পাখিদের মধ্যে চলতে থাকে।

এই সময়ে আমরা একটা বিষয় যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো আমাদের চারদিকে যেভাবে তালগাছ, নারকেল গাছ ও খেজুর গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, তাতে করে এই তাঁতি পাখিরা তাদের বাসস্থানের জায়গা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এই বিষয়টা আমাদের খুব চিন্তার হয়ে উঠেছে। নগরায়ণের কুফলও দারুণ ভাবে আজ এদের উপরে পড়েছে। কোনো উপায় না পেয়ে বাবুই পাখিরা আজ জলাশয়ের কাছে বন জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাসা বুনতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু তাই নয় অনেক সময় দেখা গেছে এরা বৈদ্যুতিক তারের মধ্যেও এরা বাসা বুনছে। এটা আজ আমাদের খুব ভাবনার বিষয়। অনেক আগের সেই বাসার সৌন্দর্য ও চৌলুস অনেকটাই যেন ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। বাসার আকারও আগের থেকে মনে হচ্ছে কেমন যেন অনেকটাই ছোটো হয়ে যাচ্ছে। ওরাও হয়তো পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। এই রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ওরা আপ্রান চেষ্টা করে চলেছে।

আজ সত্যিই কিন্তু এবার এদের নিয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে। এদের থাকার জন্য যে পরিবেশের দরকার সেটা ক্রমশ যেন আজ হারিয়ে যাচ্ছে। এটা যদি এই রকম ভাবে চলতেই থাকে তবে এমন এক দিন আসবে যেদিন এই পাখির দেখা আমরা হয়তো আর পাবোনা তার সাথে এর সুন্দর বাসাকেও হারাবো, তখন বইয়ের পাতাতেই এদের স্মৃতি আবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে। আমরা সবাই মিলে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে পৃথিবীটা ওদের বেঁচে থাকার উপযোগী করে তুলব। এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবুজ গাছ ও জলাশয় সংরক্ষন করার সাথে সাথে হোগলা ও নলখাগরার গাছকেও আজ বাঁচিয়ে রাখার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাবুই পাখির আগামী ভবিষ্যৎ যাতে আরো ভালো হয়ে উঠে সেই দিকেই আমাদের সবার একটু নজর যদি পড়ে তবে খুব ভালো হয়। ওরা ভালো করে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকুক।

লেখক মেটোলার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও পরিবেশকর্মী

email: tapaskumardatta2012@gmail.com • M. 9830413451

ড. তুষার কান্তি নাথ

স্মরণে অভিজিৎ চাকলাদার

আমি তখন স্কুল ছাত্র। বিজ্ঞান সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, র‍্যালিতে সদ্য যুবা এক ছেলেকে দেখা যেত নিয়মিতভাবে। সেই অনুষ্ঠানগুলির বেশির ভাগ সময়েই তার গলায় ঝুলত, সুন্দর হাতের অক্ষরে লেখা সচেতনতামূলক হরেকরকম পোস্টার। হরিণঘাটা অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী র‍্যালি বা বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোনো প্রোগ্রামে তাকে দেখা যেত প্রায়শই। তবে এক দেখাতেই মনে রাখার মত সপ্রতিভ চেহারা তাঁর না থাকলেও, তাকে মনে থেকে গেছে তার কাজে, তার নিষ্ঠায়, তার অংশগ্রহণে। পরে জেনেছি 'হরিণঘাটা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি'র সেই নিষ্ঠাবান সদস্যের নাম অভিজিৎ চাকলাদার। পরিচিত হয়েছি তার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে, ঘনিষ্ঠ হয়েছি ব্যক্তিগতভাবেও।

হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা

বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রচারক, মাননীয় সমর বাগচীর অনুপ্রেরণায় এবং সক্রিয় সহযোগিতায় 'কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার' বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন করে। ফেলে দেওয়া বা খুব স্বল্পমূল্যের জিনিসপত্র দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষা দেখানোর কাজেও অভিজিৎ চাকলাদার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সেই অনুষ্ঠানগুলির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং কখনও কখনও বিজ্ঞান পরীক্ষা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিজ্ঞান দরবারের মাননীয় জয়দেব দে-র সহযোগী হিসেবে হরিণঘাটা অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় অভিজিৎ অংশগ্রহণ করেছে।

বিদ্যাসাগর ও রামমোহন স্মরণে

হরিণঘাটা অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্ম বর্ষ এবং রাজা রামমোহন রায়ের সার্ধদ্বিশত জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে অভিজিৎ সক্রিয় ভূমিকা নেয়। হরিণঘাটায় রামমোহন উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে, রামমোহন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা আয়োজন, রামমোহনের জন্মদিন ও মৃত্যু দিনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সম্পাদন, রাজা রামমোহন রায় স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিজিতের অগ্রণী অংশগ্রহণ প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন কাজে তার হার না মানার মানসিকতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিজ্ঞান প্রসার

কাঁচরাপাড়ার বিজ্ঞান দরবার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা, 'বিজ্ঞান অন্বেষক" এর অন্যতম প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ী ছিলেন অভিজিৎ চাকলাদার। হরিণঘাটা অঞ্চলের আগ্রহী ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে "বিজ্ঞান অন্বেষক" পৌঁছে দেওয়া, বার্ষিক সদস্যপদ গ্রহণে উৎসাহিত করা, সদস্যপদ নবীকরণ ইত্যাদি কাজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিজিৎ করে গেছেন। পত্রিকাগুলি বিজ্ঞান দরবারের কাঁচরাপাড়া অফিস থেকে তাকেই বহন করে নিয়ে আসতে হত। আর এইসব কাজগুলি সে স্বেচ্ছায়, অবৈতনিক ভাবে করত, নিতান্তই বিজ্ঞান প্রসারের তাগিদে।

বিজ্ঞান কর্মী

"হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি", "ডা: দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতি রক্ষা কমিটি, হরিণঘাটা শাখা" "বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া" এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের হয়ে সে স্বেচ্ছায়, নিজ-আগ্রহে সকল কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কর্মসূচির রূপায়ণের আগাগোড়ায় তার উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং কর্মতৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। পর্দার আড়ালে এবং পর্দার বাইরের বিভিন্ন সূচিতে সে অবাধভাবে বিচরণ করত। হরিণঘাটা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসাবে অভিজিৎ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কোথাও সাপে কামড়ানো রোগীকে ওঝার ঝাড়ফুঁক থেকে মুক্তি দিতে, গণেশের দুধ পান ঠেকাতে, ডাইনি "চিহ্নিত" ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে বা যে কোনো কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে সবার আগে যাকে পাওয়া যেত সে হল অভিজিৎ চাকলাদার। আদতে অভিজিৎ ছিল একজন আদ্যোপান্ত বিজ্ঞান কর্মী।

জীবনের ধারাপাত

হরিণঘাটার সুবর্ণপুরে ১৯৬৮ সালে অভিজিতের জন্ম। লাউপালা কল্পতরু উচ্চ বিদ্যালয় এবং বড়জাগুলী গোপাল একাডেমি থেকে স্কুলের পাঠ শেষ করে নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে পড়াশোনা শুরু করে এবং সেখান থেকে বি. কম. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ইতিহাসসহ দুটি বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাবল এম. এ. করেন। এছাড়াও বায়োকেমিক মেডিসিনে তার আগ্রহ ও পড়াশোনা ছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে ফিজিওথেরাপিতে ডিপ্লোমা করছিল।

সারা জীবন ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন অকৃতদার অভিজিৎ। হরিণঘাটা অঞ্চলে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজ চেতনা, পরিবেশ রক্ষায় তার অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর অকালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে শেষ হয় এই বর্ণময় জীবনের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার,
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবন নাথ, শান্তচরণে এসো।"

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: tushar_kly@rediffmail.com • M. 9635547188

রো শ নী হা ল সা না

‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ একটি পরিবেশ পত্রিকার পথচলা

পরিবেশ পত্রিকা ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ (Bio-diversity Conservation News Letter) হলো বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পরিবেশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ত্রৈমাসিক। এটি গোবরডাঙা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির মুখপত্র হিসেবে ২০২০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম বছরে করোনা আবহে এর চারটি সংখ্যা একসাথে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০) প্রকাশ পেয়েছিল। ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারি (রবিবার) গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ (ত্রৈমাসিক) প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরিবেশবিদ দেবল দেব ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র প্রথম সংখ্যাটি উন্মোচন করেছিলেন। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ ও তেপুল মির্জাপুর পরিবেশ সুরক্ষা সমিতির আয়োজনে সেদিনের সভায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রবীণ বিজ্ঞানকর্মী দীপককুমার দাঁ।

‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে (২০২১ সালে) এর দুটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ পায় প্রথম ও দ্বিতীয় (যুগ্ম) সংখ্যা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ (যুগ্ম) সংখ্যা। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ (যুগ্ম) সংখ্যাটি (জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১) প্রকাশিত হয় ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে সংখ্যাটির আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট ধান বিশেষজ্ঞ অনুপম পাল। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সৈকতকুমার বসু ও অনির্বাণ রায়। ২০২২ সালে ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ পত্রিকা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে। তৃতীয় বর্ষে এই পত্রিকার একটি যুগ্ম সংখ্যা এবং দুটি একক সংখ্যা প্রকাশ পায়। তৃতীয় বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় (যুগ্ম) সংখ্যাটি (জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন ২০২২) প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নজরুল স্মৃতিধন্য কৃষ্ণনগরের গ্রেস কটেজে প্রথম পরিবেশ মেলায়। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এবং নদিয়া পরিবেশ মঞ্চ, কৃষ্ণনগর পরিবেশ বন্ধু ও সুজন বাসরের সহযোগিতায় এই পরিবেশ মেলা হয়েছিল। সেখানেই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবাশিস মণ্ডলের হাত দিয়ে ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র নতুন সংখ্যাটির আবরণ উন্মোচিত হয়। সঙ্গে ছিলেন শিল্পী লালমোহন গুড়িয়া ও লেখক প্রকাশ দাস বিশ্বাস।

‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটি (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ৫ জুন ২০২২ নদিয়া পরিবেশ মঞ্চের দ্বিতীয় পরিবেশ মেলায় প্রকাশিত হয়। পরিবেশ সংগঠন নেচার ফার্স্টের আয়োজনে রানাঘাট পৌরসভা প্রাঙ্গণে এই পরিবেশ মেলা হয়েছিল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র সাঁতরা পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করেন। সহযোগিতায় ছিলেন রানাঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান কোশলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, নদিয়া পরিবেশ মঞ্চের সভাপতি বিপ্লব দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা অবর্ণা মুখোপাধ্যায়, অশোক মৌলিক, মুনমুন কীর্তনীয়া প্রমুখ বিশিষ্টজন এবং ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র প্রকাশক দীপককুমার দাঁ ও পত্রিকা সম্পাদক দীপাঞ্জন দে। ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ (শনিবার) কৃষ্ণনগর পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম কৃষ্ণনগর বইমেলায় প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটির আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক সম্পদনারায়ণ ধর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট কবি রামকৃষ্ণ দে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পরিবেশ পত্রিকা হিসেবে ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছে। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রাণপুরুষ প্রবীণ বিজ্ঞান প্রচারক দীপককুমার দাঁ ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র প্রকাশক। মুক্ত সারস্বত জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ থেকে এই পরিবেশ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন অনুপম পাল, সহ-অধিকর্তা, কৃষিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলী এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে বহু গুণী মানুষ রয়েছেন। যেমন বর্তমানে এই পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, মৃদুল শ্রীমানী, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সরকার, শতাব্দী দাশ, শৈলেন চণ্ডী, সুনীল বিশ্বাস, সৈকত বসু, সুকুমার মিত্র, শাশ্বতী রায়, অনির্বাণ রায়, প্রভুদান হালদার, অনিলকুমার সরকার, সুব্রত বিশ্বাস, গার্গী সেনগুপ্ত। আর সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন কণাদ বৈদ্য, জয়দেব দে, বিক্রম মিত্র, রাজা রাউত, দেবাশিষ পন্ডা, উজ্জ্বল কাঞ্জিলাল, তন্ময় ধর। অফিস সহায়তায় রয়েছেন অর্ণব কুণ্ডু, দুলাল বর্মণ, শুভ্রা বৈদ্য। পত্রিকার প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও অক্ষরবিন্যাসে গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস (হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা)। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সৌরভ দুয়ারি। এই পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের পদ অলংকৃত করছেন বিশিষ্ট প্রাণীবিজ্ঞানী সিদ্ধার্থনারায়ণ জোয়ারদার। আর ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’ পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন পরিবেশকর্মী দীপাঞ্জন দে। ২০২৩ সালে এই পরিবেশ পত্রিকা তার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করে। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে আয়োজিত পরিবেশ কর্মশিবিরে ‘জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা’-র নতুন সংখ্যার আবরণ উন্মোচিত হয়। পরিবেশ কর্মশিবিরে লেখক প্রকাশ দাস বিশ্বাস এবং বরিষ্ঠ

বিজ্ঞানকর্মী জনরঞ্জন গোস্বামীর হাত দিয়ে 'জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা'-র চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যাটি (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) প্রকাশ পায়। ৩০ জুলাই ২০২৩ কৃষ্ণনগরের গ্রেস কটেজে দীপককুমার দাঁ ও দীপাঞ্জন দে-র আহ্বানে আয়োজিত পরিবেশ শিবিরে 'জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা'-র চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় (যুগ্ম) সংখ্যা (এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক দেবনারায়ণ মোদক এবং নদিয়া পরিবেশ মঞ্চের আহ্বায়ক বিজ্ঞানকর্মী সুব্রত বিশ্বাস। 'জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা'-র চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) ২৬ নভেম্বর ২০২৩ প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সমীর সাহার হাত দিয়ে পত্রিকার নতুন সংখ্যাটি উন্মোচিত হয়।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে 'জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা'-র মতো পরিবেশ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করতেই হয়। সম্পাদক দীপাঞ্জন দে বলেন "আমরা এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে চাই। পাশাপাশি যে সকল সংগঠন বা ব্যক্তি মানুষ এই কাজে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের কথা আমরা পত্রিকার পাতায় তুলে ধরতে চাই। আমাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে রাজ্য তথা দেশের পরিবেশকর্মীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করার কাজে নিয়োজিত।" ২০২০ সাল থেকে এই পরিবেশ পত্রিকার পথচলা শুরু হয়েছে। ২০২৪ সালে এই পত্রিকা তার পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি মার্চ মাসে (২০২৪) প্রকাশ পেতে চলেছে। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত পরিবেশ মেলা, বিজ্ঞান মেলা, লিটিল ম্যাগাজিন মেলা, বইমেলায় এই পরিবেশ পত্রিকা প্রেরণ করা সম্ভব হয়। এর প্রতিটি সংখ্যা যে কত যত্ন নিয়ে নির্মাণ করা হয়, তা অনুধাবন করা যায় সহজেই। পত্রিকার পাঠকদের জন্য পরিবেশ বিষয়ক খবরা-খবরের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ, তথ্যরাশি, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের চিত্রাবলি এখানে মুদ্রিত করা সম্ভব হয়। 'জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বার্তা'-র মতো পরিবেশ পত্রিকার এই রকম সাহসী পথচলা প্রকৃতি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং পরিবেশ বন্ধু বহু মানুষকে আগামী দিনেও অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করি।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: roshni.h2313@gmail.com • M. 8348856867

সংবাদ

রা জ দী প ভ ট্টা চা র্য্য

পুড়ছে চিলি

সাম্প্রতিক কালে পরিবেশবিদরা বারবার আমাদের সচেতন করে আসছেন এই অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা এবং পৃথিবীর উপর তার অভিঘাতের বিষয়ে। দুঃখের কথা আমাদের ভাবনা, আচরণ ও বিবেচনায় তা কিছুতেই গভীর আঁচড় কাটতে পারছে না। আর তাই জীবন দিয়ে, প্রকৃতিকে নষ্ট করে তার দাম মেটাতে হচ্ছে। পৃথিবীমায়ের গায়ে রয়ে যাচ্ছে সেই দগদগে ঘা।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ আমেরিকান উপকূল বরাবর সাধারণ ভাবে কুমেরু মহাসাগর থেকে আসা শীতল হামবোল্ড স্রোত প্রবাহিত হয়। কিন্তু কয়েক বছর অন্তর শীতল স্রোতের পরিবর্তে একটি উষ্ণ স্রোতের আবির্ভাব ঘটে। ডিসেম্বর মাসে যিশুর জন্মদিনের সময়ে এর আগমন লক্ষ্য করা যায় বলে একে 'এল নিনো' (= শিশু খ্রিস্ট) বলা হয়। এই উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে নিকটবর্তী চিলি, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, কলোম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বাতাসে শুষ্কতা বাড়ে। মাটি শুষ্ক ও আলগা হয়ে যায়। খরার কারণে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় গাছপালা শুষ্ক হওয়ায় সহজেই আগুন ধরে যায় এবং দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

বিগত কয়েকদিন ধরে চিলির বেশ কিছু অংশ জুড়ে দাবানলের সমস্যা ভয়ানক আকার নিয়েছে। গত ৩১ জানুয়ারি চিলির সান্তিয়াগোতে উষ্ণতা ৩৭.৩° সেন্টিগ্রেড ছুঁয়েছে, যা গত ১১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভ্যালপারাইসো প্রদেশ তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি। সেখানে উষ্ণতা ৪০° সেন্টিগ্রেডের সীমা ছাড়িয়েছে। কলম্বিয়াতেও অবস্থা উদ্বেগজনক। সেখানে জেরুসালেনে উষ্ণতা ৪০.৪° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে। আর্জেন্টিনাতেও গত ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি জুড়ে তাপপ্রবাহ চলছে। এরফলে মধ্যচিলির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল। তীব্র বায়ুপ্রবাহের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে একস্থান থেকে অন্যত্র। কালো ধোয়ায় ঢেকে ফেলেছে গোটা এলাকা। এখন অবধি ৬৪ হাজার হেক্টর জমি দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত। ভিনে-ডেল-মার, কুইলপে, ভিলা এলেমানা প্রভৃতি শহরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতি ছাড়াও অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমানও যথেষ্ট। প্রায় দুশো মানুষ নিখোঁজ, যাদের মধ্যে ১১২ জনের মৃত্যু ঘটেছে বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে। জনমানবহীন শহরগুলিতে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটের আশঙ্কা এড়াতে সমগ্র এলাকায় কার্ফিউ জারি করা হয়েছে। চিলির প্রেসিডেন্ট বলেছেন "পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক"। বন দপ্তর, সেনাবাহিনী, দমকল বিভাগ সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে দাবানল নিয়ন্ত্রণে।

চিলিতে দাবানল অবশ্য নতুন বিষয় না। ২০১৭ সাল থেকে লাগাতার ভাবেই দাবানলের ঘটনা ঘটছে। গতবছরেও ৪ লক্ষ হেক্টর জমি পুড়ে খাক হয়ে গেছিল এবং ২২ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। যাইহোক এই কঠিন সময়ে এটুকুই উপলব্ধি করার যে শুধু চিলি নয় এই অবস্থা আগামী পৃথিবীর ভবিতব্য। যে হারে সমগ্র বিশ্বজুড়ে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে চলছে তাতে এই সভ্যতা ক্রমশ এক অস্তিত্বসংকটের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ভেবে দেখার যে এই অন্তহীন ভোগবাদের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার আগে আরও একবার আমরা প্রকৃতির কাছে, পরিবেশের কাছে এবং জীবনের কাছে এগিয়ে যেতে পারি কিনা!

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: rajdipb5678@gmail.com • M. 9836569850

স ব্য সা চী চ ট্টো পা ধ্যা য়

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী রবীন মজুমদার

যে পত্রিকার জন্য তাঁর পরিচিতি তার নাম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী। সকলের মুখে তার সংক্ষিপ্ত নামটাই বেশি প্রচলিত; বি ও বি। এক অর্থে তিনি নিজেও ছিলেন বি ও বি; বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী। বিজ্ঞানী তো অনেকেই হন, হন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মৃত্যুর পরে তাঁদের স্মৃতি বহন করেন তাঁদের ছাত্রেরা। কিন্তু রবীন মজুমদার তো শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানকর্মী। আর তাই ২০২৪-এর ১১ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কাজকর্মের কথা মনে করছেন অন্য বিজ্ঞানকর্মীরা কারণ তাঁর করে যাওয়া কাজের উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব তো তাঁদেরই।

স্মরণ : শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়

রবীন্দ্রনাথ মজুমদার (রবীনদা)

(২৪ নভেম্বর ১৯৪৬ – ১১ জানুরারি ২০২৪)

স্মরণসভা স্থল : মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়াম, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ, ৯২ এপিসি রোড, কলকাতা-৯
তারিখ ও সময় : ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪, শনিবার; দুপুর ২-৩০ মি

আয়োজনে: বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী (বিওবি), কালধ্বনি, ফোরাম এগেনস্ট মনোপলিস্টিক এ্যাগ্রেসন (ফামা), অঙ্কোলিঙ্ক, সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম, ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেল্থ অ্যাকশন (দিসা), ফাউন্ডেশন ফর হেল্থ অ্যাকশন, নাগরিক মঞ্চ, মানস, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি, সোসাইটি ফর সোশ্যাল ফার্মাকোলজি, গল্প বলার দল, কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও বন্ধুরা

রবীনদার পুরো নাম রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, জন্ম ১৯৪৬এর ২৪ নভেম্বর, বর্ধমান জেলার মেমারির কাছে এক গ্রামে। গ্রাম থেকে কলেজে পড়তে আসেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজে। রসায়নে সাম্মানিক হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, একই ফল হয় বি টেক এবং এম টেক (কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কেমিক্যাল টেকনোলজি)-এ। ১৯৭২এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি এইচ ডি করেন। ১৯৭৪ সালে কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৮৪-৮৫তে ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডকটোরাল ফেলো হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৩-৯৫তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনা এবং গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তবে শুধু বিজ্ঞানী পরিচয়ে তিনি তো সীমাবদ্ধ ছিলেন না।

বিজ্ঞানকর্মী রবীনদার সঙ্গে সমার্থক ছিল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা। ১৯৭৭এ এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। প্রথমে এটি দ্বি-মাসিক ছিল। ১৯৯৪ থেকে হয় ত্রৈমাসিক। শেষের দিকে বের হত বছরে একটা। বিওবি এমন এক পত্রিকা যার আদর্শ ছিল, 'বিশ্বব্যাপী চিন্তা করুন, স্থানীয়ভাবে কাজ করুন'। এখানে পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে সংঘটিত বিতর্ক এবং সমস্যাগুলিকে সহজভাবে তুলে ধরা হত। আবার স্থানীয় নানা আন্দোলন, যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় একটি প্রস্তাবিত রাসায়নিক সার কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এরাজ্যের পরমাণু অস্ত্র এবং শক্তি-বিরোধী আন্দোলনে বিওবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিওবি-র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল জনগণের স্বাস্থ্য। সমসাময়িক স্বাস্থ্য সমস্যায় সাড়া দিত বি ও বি; যেমন ১৯৮৪তে পশ্চিমবঙ্গে আন্ত্রিক রোগ দেখা দিলে বিওবি বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। ১৯৮৫তে কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায় হেপাটাইটিস ছড়িয়ে পড়লে বিওবি সরকারের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বি ও বি হোমিওপ্যাথি এবং আকুপাংচারকে চিকিৎসাপদ্ধতি হিসাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছিল। বিওবি নির্দিষ্ট ওষুধ বাজারজাতকরণের আগে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের শরীরকে গিনিপিগ করে নতুন জৈব-রাসায়নিক ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রথম বিশ্বের ভূমিকার সমালোচনা করেছিল। সঠিক চিকিৎসা পেতে ব্যর্থ সাধারণ মানুষের অভিযোগকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল বি ও বি; মানুষ বি ও বি-র পাতায় তাদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৮৪তে ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের পরে বি ও বি বিপজ্জনক রাসায়নিক তৈরির ঝুঁকি দেখানোর চেষ্টা করেছিল। মানুষ, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও ভোগান্তির ক্ষতিপূরণ না-পাওয়ায় প্রতিবাদী হয়েছিল বিওবি।

বি ও বি পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলির একটি মূল্যায়ন করেছিল যাতে ওইসব পাঠ্যপুস্তকে উপস্থিত বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক বিষয় উন্মোচিত হয়। এটি মধ্যপ্রদেশে একলব্য দ্বারা প্রবর্তিত হাতে-কলমে পরীক্ষার ভিত্তিতে অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার উপরও আলোকপাত করেছিল। বিওবি সাথী ছিল ছত্তিশগড় শহীদ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে আন্দোলন এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের স্বাস্থ্য আন্দোলনের।

এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীনদা। বি ও বি-তে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পুস্তিকা হিসেবে হাজির করার ক্ষেত্রেও প্রধান উদ্যোগ ছিল তাঁর। এভাবেই বেরিয়েছে বিজ্ঞানশিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল (১৯৮৮), বিজ্ঞানশিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল (১৯৯২)। বেরিয়েছে তাঁর নিজের লেখা বই পরিবেশ দূষণ পরিচিতি ও পরিমাপ (১৯৯৮)। একুশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে পরিবেশবিদ্যা আবশ্যক পাঠ্য হলে তিনি এবং মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার একটি উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক লেখেন; পরিবেশবিদ্যা পরিচয় (২০০২)। এই বইয়ের সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ পরিবেশ আন্দোলন। আসলে রবীনদা ছিলেন 'অ্যাক্টিভিস্ট-রাইটার'। বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেই কবে ১৯৭৯এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে বি ও বি-তে লিখেছিলেন 'বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে'। সেই সন্ধান তাঁর আজীবন জারি ছিল; তাই গত দশ বছরে লেখেন ভারতের আমআদমীর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (২০১৬), বিজ্ঞান আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল শেষ কথা বলে না দিয়ে পাঠককে ভাবনাচিন্তার পরিসর দেওয়া; কোনও কর্তৃত্ব নয়, লেখার মাধ্যমে ভাবনা ভাগ করারই চেষ্টা করতেন তিনি। আর সেজন্যই আত্ম-সমালোচনায় কখনওই কুণ্ঠিত ছিলেন না; বারবারই নিজেদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তবে তা পথ আটকানোর জন্য নয়, বিজ্ঞান আন্দোলনের নতুন দিশা খোঁজার জন্য।

লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:saby4@gmail.com • M. 9433353349

ড. ভবানীপ্রসাদ সাহু

মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষ চিকিৎসা

এই জ্যোতিষ চিকিৎসা বা মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি-র কথা এখন বেশ শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে এই বিষয়টি এখনকার চিকিৎসাবিদ্যার পাঠক্রমে বিশেষ করে আয়ুর্বেদ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জ্যোতিষবিদ্যা তথা অ্যাস্ট্রোলজি যখন অবৈজ্ঞানিক তথা অপবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসার ব্যাপারটা আদৌ কি যথার্থ বা বিজ্ঞানসম্মত?

জ্যোতিষবিদ্যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ গ্রহনক্ষত্র নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবীর মানুষের জীবন, শরীরস্বাস্থ্য, মন ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহাকাশে তাদের অবস্থান দেখে মানুষের রোগের নির্ধারণ, তার চিকিৎসা এবং এমনকি তার ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলীরও আঁচ পাওয়া সম্ভব। আসলে প্রাচীনকালে যখন মানুষের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান ছিল অতি সীমিত, তখনকার মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তথা পৃথিবীর মানুষের জীবনের নিয়ন্তা হিসেবে এক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য সত্তার কল্পনা করেছে। একই সঙ্গে ভেবেছে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তনও তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে। আর তাদের এই অবস্থান দেখে ঐ সর্বশক্তিমানের মনোবাসনা বোঝা যাবে। কোন মানুষের জন্মের সময় ঐসব গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান কি ছিল তার বিচার করে ঐ মানুষের জীবন ও চরিত্র যেমন হবে তার বিচার করাও শুরু হয়। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা এই ধরনের নানা প্রচেষ্টার জন্ম দেয়, যার সাহায্যে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা হয়।

কিন্তু এখন জানা গেছে প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সূচনার পর কিভাবে গ্রহনক্ষত্র এই মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান থাকে, কিভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণ তথা মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এটিও এখন প্রমাণিত যে ঐসব গ্রহনক্ষত্র তাদের দুর্বল মহাকর্ষ বল বা অন্য কোনভাবে পৃথিবীর মানুষের তথা বাঘ, ছাগল, হাতি ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রাণ বা জীবনকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। এগুলি এখন অবিতর্কিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শুধু জ্যোতিষচর্চা নয়, তার সাহায্যে রোগ চিকিৎসার চেষ্টা করা বিপজ্জনক ও অবৈজ্ঞানিক শুধু নয়, হাস্যকরও বটে।

এই মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজির ব্যাপারগুলি শুধু আমাদের দেশে নয়, ইয়োরোপ, মিশর, চিন ইত্যাদি দেশেও একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। ইয়োরোপে যায় আরব থেকে এবং ১৪৫০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে ইয়োরোপে তার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে। এই বিষয়ে নানা ধরনের কাল্পনিক সিদ্ধান্ত করা হয়। যেমন বলা হত বুধ গ্রহ মস্তিষ্ক ও শ্বাসতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বীজওয়ালা উদ্ভিদ, গাজর, বাদাম ইত্যাদি এই গ্রহের সঙ্গে যুক্ত। শুক্রগ্রহ হজম প্রক্রিয়া, কিডনি—এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তার গাছগাছড়া নাকি সূর্যের সঙ্গে যুক্ত, চাঁদকেও গ্রহ ভেবে মেয়েদের ওভারি (ডিম্বাশয়)-এর সঙ্গে এবং বাঁধাকপি, তরমুজ, কুমড়ো ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবা হয়েছে। অন্যান্য নানা তথাকথিত 'গ্রহ' সম্পর্কেও এই ধরনের নানা মনগড়া বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঐ অনুযায়ী চিকিৎসাও করা হত। বিভিন্ন দেশে এসবের খুঁটিনাটি, ছোটবড় পার্থক্য বা বৈচিত্র্যও থাকত।

কিন্তু এখন ইয়োরোপ থেকে চিন, আরব থেকে মিশর—কোন দেশেই আর ঐ বহু শতাব্দী প্রাচীন ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জ্যোতিষ চিকিৎসা বা মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজির মত চিকিৎসা আর অনুসরণ করা হয় না। এমনকি যাঁরা এই ধরনের চিকিৎসার প্রসারের কথা বলছেন তাঁরাও নিজেদের প্রাণঘাতী কোন অসুখ হলে তা অনুসরণ করেন না, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে নেন, যেমন কোভিড-১৯ অতিমারির সময় এদেশে কেউ কেউ কোভিড-এর মোকাবিলায় গোমূত্র বা ভাবিজি পাঁপড়-এর কথা বলেও নিজেদের যখন কোভিড পজিটিভ হল, তখন এসবে অবলম্বন না করে আধুনিক চিকিৎসার হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছিলেন।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছে। এর আগে শত শত বছর ধরে মানুষ নানা অভিজ্ঞতায় যেসব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ও অনুসরণ করেছে, ঐসব পেরিয়ে এবং তাদের ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন ঐসব ধ্যানধারণা বিশ্বাস অনুমান কল্পনা ইত্যাদি এক একটি ধাপ। প্রাচীন জ্ঞানের ঐসব ধাপকে অপমান বা অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু আরো অবৈজ্ঞানিক হল প্রাচীন ঐতিহ্যের নাম করে আগেকার ঐসব ধাপ—এই দাঁড়িয়ে থাকা।

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 8777598939

তাপস কুমার দত্ত

বাবুই পাখিরা বাসভূমি হারাচ্ছে

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চার রকমের বাবুই পাখির দেখা পাই। ১) Baya Weaver বা বাংলাতে যে বাবুই পাখিকে আমরা শুধুই বাবুই পাখি বলে থাকি। এই বাবুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Ploceus philippinus*। ২) Black–breastd weaver যাকে বাংলাতে আমরা কালো বুক বাবুই বা সরবাবুই বলে থাকি যার বৈজ্ঞানিক নাম হল— *Ploceus benghalensis*। এদেরকে খুব কম সংখ্যাতেই আজকাল দেখা যায়। কখনও কখনও অনেক *Baya Weaver* বাঁকের মধ্যে দুই একটির দেখা মেলে ৩) Streaked Weaver বাংলাতে যাকে বলে তিলে বাবুই, এটাও খুব কম সংখ্যাতে পাওয়া যায়, যার বৈজ্ঞানিক নাম হল— *Ploceus manyar* ৪) Finn's Weaver যার বৈজ্ঞানিক নাম হল— *Ploceus megarhynchus*—এদেরও খুব কম সংখ্যাতে আজ পাওয়া যায়।

বাবুই পাখিদের জীবনযাত্রা খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাবুই পাখিরা সাধারণত সেখানে অনেক ঘাস আছে সেই রকম জমি, যে জমিতে ফসল ফলানো হয় সেখানে এরা দলবদ্ধ হয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তাল, নারকেল ও খেজুর গাছে তৈরি করা পাত্রে বা উলটো কলসি যেমন দেখতে হয় ঠিক সেইরকমের বাসা এরা অসাধারণ নিপুণ দক্ষতার সাথে বানায়। যা কিনা এই সমস্ত গাছে সুন্দর ভাবে ঝুলে থাকে। এই অসাধারণ বাবুই পাখির বাসা তার একমাত্র ঠোঁট দিয়ে তৈরি করে থাকে। তাঁতিরা যেমন তাঁত দিয়ে কাপড় বুনন করে থাকে এরাও ঠিক এদের বাসাকে ঠোঁটের সাহায্যে গড়ে তোলে। তাই তো আমরা হয়তো এদের তাঁতিপাখি বলে থাকি। এদের বাসা বানানোর কৌশল আমাদের সবাইকে খুব অবাক করে দেয়। এদের বাসার শুরুতে দুটি গর্ত থাকে। পরে একদিক বন্ধ করে সেখানে ডিম রাখার ব্যবস্থা করে। অন্য অংশটি লম্বা করে বানায়। যাতে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ করা হয়।

বাবুই পাখি দৈর্ঘ্যে ১৫ সেমির মতো হয়ে থাকে। প্রজনের সময় (সেপ্টেম্বর মাস) স্ত্রী ও পুরুষ প্রভেদ ভালোভাবে বোঝা যায়। এই সময়ে পুরুষ পাখির মাথা উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। বুকের দিকে অংশ হলুদ এবং নীচের দিকটা হালকা ক্রিম হয়ে থাকে।

BIGYAN ANNESWAK VOL : 21 Issue No. 2 March - April 2024 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20-
ISSN 2582-5674

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী : **কৃষ্ণসার মৃগ**
সাধারণ ইংরাজি নাম : Black Buck/Indian Antelope
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Antelope cervicapra

পাঞ্জাবের রাজ্যপ্রাণী এটি। একদিকে হরিয়ানা ও অন্ধ্রপ্রদেশেরও রাজ্যপ্রাণী এরা। পেচানো ও নক্সাকাটা শিং-এর জন্য বিখ্যাত এরা।
অত্যন্ত দুর্লভ এই স্তন্যপায়ী উত্তরাখন্ডের করবেট জাতীয় উদ্যান, গুজরাটের ভেলাবাদার ব্ল্যাকরাক জাতীয় উদ্যান, কানহা জাতীয় উদ্যান (মধ্যপ্রদেশ) প্রভৃতি এলাকায় এদের দেখা যায়। ভারতের বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭২-এর নিয়ম অনুসারে এরা তপশিল ভুক্ত সংরক্ষণ প্রাণী এরা। IUCN এর লাল তালিকায় সঙ্কটজনকভাবে বিপন্ন এরা।

সরিসৃপ : **নরম খোলস কচ্ছপ**
সাধারণ ইংরাজি নাম : Black Softshell Turtle
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Nilssonia nigricans

অত্যন্ত দুর্লভ এই কচ্ছপকে বোস্তামি কচ্ছপও বলে। কারণ—কথিত আছে অষ্টাদশ শতকে হজরত বায়জিদ বোস্তামি—ইরান থেকে এনে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে স্থানীয় পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যদিও আজ এরা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে লুপ্ত—খোদ ইরানেও। সেইজন্য IUCN ২০০২ সলে এই প্রজাতিকে লুপ্ত ঘোষণা করে দেয়। বর্তমানে আসামের হায়াগৃভ মাধব মন্দিরের পুকুরে এবং ত্রিপুরার সুন্দরী মন্দিরের কল্যাণসাগর হ্রদে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা অস্তিত্বের সংকটাপন্ন এই প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পক্ষী : **অস্টিনের বাদামি ধনেশ**
সাধারণ ইংরাজি নাম : Austen's Brown turnbill
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Anorrohinus austeni

দুর্লভ এই ধনেশ পাখিটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড-এ পাওয়া গেলেও বর্তমানে প্রধানত ভারতের অরুণাচল প্রদেশের নামধাপা জাতীয় উদ্যানেই দেখা মেলে এদের। CITES এর Appendix-১১-তে এরা তালিকাভুক্ত হলেও দেখতে পাওয়া দুর্লভ। এই ধনেশ নিয়ে বিজ্ঞানীদের খুব বেশি কাজ নেই। তাই বহু তথ্য এখনও অজানা আমাদের কাছে।

মাছ : **বিশ্বকাপ ঝি ঝি পোকা**
সাধারণ ইংরাজি নাম : World Cup Cicada
বিজ্ঞানসম্মত নাম : Chremstica ribhoi

অত্যন্ত দুর্লভ এই ঝি ঝি পোকা ভারতে পাওয়া যায় মূলত মেঘালয়ে এবং প্রতি চার বছর অন্তর এর আবির্ভাব ঘটে। কাকতালীয়ভাবে বিশ্বকাপ ফুটবলের বছরেই এদের বেশি দেখা যায়। সেই কারণে এটিকে বিশ্বকাপ ঝি ঝি পোকাও বলা হয়। অত্যন্ত দুর্লভ এই প্রকার ঝি ঝি পোকা উত্তর-পূর্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ বিশেষ করে মেঘালয়ে।

email : rajarouthbhbl@gmail.com M. 9474417178